Vol. 52 | No. 1 | 2014

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

শতাব্দ-সন্ধির দিশারী কবি : খোন্দকার আশরাফ হোসেন

Volume	52
Issue	1
Year	2014
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Tarana Nupur
Published online	October 1, 2014
DOI	10.62328/sp.v52i1.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v52i1.5
Pages	১২৭-১৫৬
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

শতাব্দ-সন্ধির দিশারী কবি : খোন্দকার আশরাফ হোসেন

Check for updates

তারানা নুপুর*

কবিতার বার্ধক্য নেই, কেবল বিবর্তন আছে। 'গতকাল আজকের হাত ধরে চুমু খেয়ে' বিদায় নেবে — এই অনিবার্য। সময় শূন্য থাকে না কখনো, প্রান্তর যেমন থাকে না নিষ্কর্ষিত। বিশ্বযুদ্ধের পোড়া জমিতেও জন্ম নেয় নতুন দর্শন, নতুন কবিতা। কিন্তু যে কোনো সংক্রান্তিই যুযুৎসাতাড়িত, বিবাদবিসংবাদে সংঘাতপূর্ণ ; জটিল ও অনম্য। বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এমনি এক সংক্রান্তির সজ্ঞাবান, ধীমান কবি খোন্দকার আশরাফ হোসেন (১৯৫০–২০১৩)। তিনি যেন শতাব্দ-সন্ধির ত্রিকালদর্শী নিরাসক্ত সঞ্জয় — একসাথে দেখেছিলেন আধুনিক কবিতার অস্তগমন ও উত্তরাধুনিক কবিতার সূর্যোদয়। অথচ তাঁকে বলা যাবে না আধুনিক কবিতার উত্তরসূরি; তিনি নন উত্তরাধুনিকদের পথিকৃৎ। এই দুইয়ের জটিল সন্ধিক্ষণে বাংলা কবিতায় তাঁর উপনায়ন এবং স্থিরপ্রাজ্ঞ উপস্থিতি। সংক্রান্তির ঝঞ্ঝা ও রৌদ্রে দীপিত তাঁর কবিতা অথচ স্বকীয়তায় অনন্যনির্ভর।

আশির দশকে বাংলাদেশের কবিতার প্রিয় চত্বরে পদন্যাসের পূর্বে খোন্দকার আশরাফ হোসেন চিনে নিয়েছিলেন তার পূর্বাপর, রাস্তা-ঘাট। গিনসবার্গের 'বীট' আর পশ্চিমবঙ্গের 'হাংরি' ধারা বাহিত এদেশের কবিতার ষাটের দশকের 'স্যাড' প্রজন্মের দেশ-কালবিস্মৃত দুঃখবিলাস ও কলাকৈবল্যবিহার যেমন তাঁকে আকৃষ্ট করেনি, তেমনি 'স্বাধীনতা'-'স্বাধীনতা' করে চিৎকৃত, শ্লোগান-উপচিত কলা-দুর্লভ সত্তরের কবিতাও তাঁকে তৃপ্ত করেনি। বাংলাদেশের কবিতায় 'বহির্মুখিতা' ও 'নান্দনিকতা'র সমন্বয়ের অভাব তিনি প্রথম থেকেই অনুভব করেছিলেন অথচ কবিতার জন্য 'বহির্জীবনের প্রখর রৌদ্র' এবং 'অন্তর্জীবনের শিশির সম্পাত' [আশরাফ, ১৯৯৪ : ১০] — এ দুইকেই অপরিহার্য বলে চিহ্নিত করেছিলেন। বাংলাদেশের কবিতাকে তার ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন না করে আধুনিকতা-উত্তর নতুন নান্দনিকতায় স্পন্দিত করার স্বপ্নে আশির দশকে বাংলা কবিতায় নিজেকে অভিষিক্ত করেন খোন্দকার আশরাফ হোসেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে পাশ্চাত্যে শুরু হওয়া উত্তরাধুনিকতা-বিষয়ক অন্তঃরক্তক্ষয়ী তত্ত্বযুদ্ধের পটভূমিতে বিশ্ব শতকের আশির দশকে 'তিন রমণীর ক্বাসিদা' (১৯৮৪) লিখে তিনি যখন কবিরূপে স্বল্প পরিচিত, বাংলাদেশের কবিতাও সংক্রান্তির স্বভাবে তখন এলোমেলো, বিশৃঙ্খল, বেপথু। সহস্রাব্দের প্রবল বাত্যাবিক্ষোভে দাঁড়িয়ে সংবেদনার 'অনঘ এন্টেনা' দিয়ে তিনি অনুধাবন করতে চেয়েছিলেন সময়ের নতুন অভীপ্সাকে —

> নতুন সহস্রাব্দের চাতালে দঁড়িয়ে নানা রকম ভাবনা দ্বারা পীড়িত হই। বিবিধ অর্থেই এক সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছি আমরা। ...আমাদের চোখের সামনে সত্যি এক গোধূলিসন্ধ্যার নৃত্য। জানি না মহাকালের কোনো এক অজানা রহস্যের শিশু এখনো 'slouching towards to be born' কিনা! [আশরাফ, ২০১০গ : ৫৭]

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়।

সময়ের বিপর্যাস তাঁকে উৎকণ্ঠিত করেছে, কিন্তু অনিকেত করেনি। 'অয়নান্তের আয়না'য় দাঁড়িয়ে তিনি সুস্থির চিন্তা-প্রপঞ্চ দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন এ কালবেলার অভিলাষকে। দুই বিশ্বযুদ্ধের পর দুই প্রজন্মের চাওয়া-পাওয়ার হিসেব নিয়ে চলে তুমুল বাক-বিতণ্ডা। বিশ্বতাত্ত্বিকদের সে এক আশ্চর্য সমুদ্রমন্থন যেন — অমৃত ও গরলকে পৃথক করার প্রাণান্ত প্রয়াস। খোন্দকার আশরাফ হোসেন এই সব ঘটনার পরোক্ষ সাক্ষী, কারণ তত্ত্ব ও ইতিহাস আত্তীকরণে তিনি ছিলেন অগস্ত্যেরও অধিক পারঙ্গম।

১৯৬৮ সালে রোলাঁ বার্থ (১৯৫০-১৯৮০) তাঁর 'The Death of the Author' প্রবন্ধে লেখকের মৃত্যু ঘোষণা করলেন[১] — কবিকে বিচ্ছিন্ন করলেন তাঁর কবিতা থেকে। কবিতা যেন কবির এক কানীন পুত্র — তাকে প্রসব করেই অন্তরালে সরে যেতে হবে কবিকে, কুমারী মাতার মতো আড়ষ্ট হয়ে। রোলাঁ বার্থ ঘোষিত 'পাঠক-জন্মে' কবিতার সকল স্বত্ব হয় পাঠকের। পাঠক নির্ধারিণ করবে তার গোত্র-জ্ঞাতি, যোগ্যতা-অযোগ্যতা — ইচ্ছে হলে তাকে সূতপুত্র বলবে, ইচ্ছে হলে রাজপুত্র, ধর্মপুত্র কিংবা ঘুঁটেকুড়ানির ছেলে। কবিতা পরিগণিত হলো বিশুদ্ধ 'টেক্সট'রূপে আর 'থিয়োরিস্ট'দের নানা শল্যপরীক্ষার নিশ্চুপ গিনিপিগে। সত্তরের দশকের শুরুতে মিশেল ফুকো (১৯২৬-১৯৮৪) পৃথিবীর ইতিহাস থেকে মানুষের অন্তর্ধান ঘোষণা করেন [Michel, 1970: 387]। মানুষ মহিমাশূন্য 'হোমোসেপিয়েন্স' মাত্রে পরিণত হয় — প্রকৃতির উপর থেকে হারায় তার আধিপত্য। জাঁ-ফ্রাসোয়া লিওতারের (১৯২৪-১৯৯৮) জ্ঞান-বিষয়ক তত্ত্ব বড় বড় পাহাড়ের মতো 'মেটান্যারেটিভ', 'গ্র্যাণ্ড ন্যারেটিভ'কে মুহূর্তেই অস্বীকার করে। তার পরিবর্তে তিনি গড়ে তুলতে বলেন 'লোকাল ন্যারেটিভে'র ছোট ছোট টিলা[২]। কারণ এইসব 'মেটান্যারেটিভ' — তাঁদের মতে, কোনো উজ্জ্বল ভোরে উপনীত করেনি মানুষকে। 'থিয়োরি'র প্রকোপে শিল্প-সাহিত্য 'মাইক্রোন্যারেটিভে'র ধারণা ভেঙে দিয়ে অতি খর্বকায় হয়ে নানা 'বৃকোলাজে'র কৃকলাসরূপে বহু রং বিচ্ছুরণ করতে থাকে । জাক দেরিদা (১৯৩০-২০০৪), জিল দ্যেল্যুজ (১৯২৫-১৯৯৫), গাতারির (১৯৩০-১৯৯২) বয়ানে ভাষা হয়ে ওঠে সকল ত্রাতার ত্রাতা। মানব-বিরোধিতাসূত্রে মানুষ হলো ভাষার দাস; ভাষা হলো মানুষের প্রভু। [Heidegger, 1978 : 348]

পশ্চিমে 'পোস্টমডার্ন' কবিতা জনপ্রিয় হতে থাকে বিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে। তার ধাক্কা এসে লাগে পশ্চিমবঙ্গের বাংলা কবিতায়। আধুনিক কবিদের সাজানো বাগান ছিন্নভিন্ন করে প্রবল বেগে বয় নতুন কবিতার ঊনপঞ্চাশ পবন (হাওয়া৪৯)। 'হাওয়া৪৯' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সমীর রায় চৌধুরী, রুদ্র কিংশুক প্রমুখ কবিরা 'পোস্টমডার্ন' কবিতার প্রতি-প্রতিনিধিত্বমূলক আত্মাভিমুখতাকে (anti-representational self-reflexivity) স্থির গণ্য করেন। তাঁরা বর্জন করেন কবিতার 'চিহ্নায়ক' ও 'চিহ্নায়িতে'র সম্পর্ককে, ভেঙে দেন যুক্তি-দর্শন ও চিন্তার ঐক্যকেও। 'থিয়োরি' দিয়ে তাঁরা 'টেক্সট'কে পাঠ করেন, ভাষাকে করেন যুক্তি ও পারম্পর্যহীন। মূলত, স্বভাব-চরিত্র চলনে-বলনে এঁরা ষাটের দশকের 'হাংরি' কবিদেরই উত্তরসূরী — যদিও নিজেদের তাঁরা পরিচয় দেন নতুন, 'পোস্টমডার্ন' কবিরূপে। দূর থেকে নানা 'পোস্টমডার্ন লীলালাস্য' দেখতে দেখতে খোন্দকার আশরাফ হোসেন এঁদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন—

> আমাদের এই অঞ্চলে উত্তরাধুনিক কবিতা বলতে যারা বিষয়হীনতা, আঙ্গিকসর্বস্বতা ও আপনাতে-আপনি-লুটোপুটি খাওয়া শব্দক্রীড়া বোঝেন, তারা এখনো পোস্টস্ট্রাকচারালিস্ট তথা আদি টেক্সটীয় পোস্টমডার্নিজমের গাড্ডায় পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন। সেই সাথে যুক্তি শৃঙ্খলাহীন চিন্তনবিশ্ব সম্পর্কে ফুকোর নসিহৎকে শিরোধার্য করে আমাদের পোস্টমডার্নরা কবিতা চর্চায় নেমেছেন। [আশরাফ, ২০১০গ : ১৪৫]

'হাওয়া৪৯' ছাড়াও অঞ্জন সেন-অমিতাভ গুপ্তকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে আরেকটি 'পোস্টমডার্ন' কবিতার ধারা সৃষ্টি হয় এ সময়। মাত্রা ও বৈচিত্র্যের পার্থক্যে এই দুই গোত্রের বৈরিতা পশ্চিমবঙ্গের 'পোস্টমডার্ন' আবহাওয়ায় নিয়ে আসে নতুন ছুৎমার্গ। শেষোক্ত গোত্রটি পশ্চিমি 'পোস্টমডার্নিজম' থেকে গা বাঁচিয়ে চলেন — নিজেদের বলেন 'উত্তর-আধুনিক' — অর্থাৎ, আধুনিক কবিদের উত্তরসূরি নন কিন্তু নতুন ও উন্নততর আধুনিকতার ধারক। কারণ তাঁরা মনে করেন ত্রিশোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতা আসলে ছিল ঔপনিবেশিক আধিপত্যের পশ্চিমি ফসল — বাংলা কবিতায় আধুনিকতা আসলে সূচিতই হয়নি তখনো পর্যন্ত। উন্মূল, অনিকেত, অহমপ্রবল আধুনিক কবিদের নাগরিক সাধনার বিপরীতে ঐতিহ্যের সান্নিধ্যে শেকড়সন্ধানী নতুন কবিতা রচনাই হলো তাঁদের অন্বিষ্ট। ঐতিহ্যের অপরিশীলিত উপাদান হলো এঁদের কবিতার মালমশলা।

আশির দশক থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের কবিতায়ও দুটি ধারা বহমান। এ দেশীয় নতুন কবিদের একটি ধারা শুরু থেকেই মেধাবী, জীবনঘনিষ্ঠ, ঐতিহ্যসম্পন্ন এবং নিরীক্ষায় ছিল অনলস — পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-আধুনিক কবিরা যাঁদের আবিষ্কার করেছিলেন বাংলাদেশের 'অনিরুদ্ধ আর্শি'রূপে। এঁরা 'পোস্টমডার্নিজম'কে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু একান্ত সংজ্ঞালুপ্তের মতো নয়। তাই 'পর ধন লোভে মত্ত' হয়ে তাঁরা ঐতিহ্য-বিস্মৃত হননি। বাংলাদেশের কবিতার চিরন্তন স্রোতের অনুকূলে তাঁরা ভাসিয়েছেন তাঁদের নতুন রঙিন নাও — বৈঠা হাতে পাল তুলে দিয়েছেন আধুনিকতার নয়া গাঙ লক্ষ করে। মাসুদ খান, মোহাম্মদ সাদিক, বায়তুল্লাহ কাদেরী, তুষার গায়েন প্রমুখ নতুন প্রতিশ্রুতিশীল এই কবিদের প্রধান 'পাটাতন' ছিল 'একবিংশ' পত্রিকা — খোন্দকার আশরাফ হোসেন ছিলেন যার একনিষ্ঠ কাণ্ডারী ও সহচর। এই মৃত্তিকা-ঘনিষ্ঠ সচেতন আধুনিক কবিদের পাশাপাশি একই সময়ে বাংলাদেশের আরেক দল কবি পশ্চিমবঙ্গীয় উত্তরাধুনিক কবিদের মতোই মানব-বর্জিত, দর্শন-নীরক্ত, শব্দজটাজাল সৃষ্টিকে সার্থকতা মনে করছিলেন — এঁরাও যথারীতি 'পোস্টমডার্ন' প্রহেলিকায় আচ্ছন্ন হয়ে কলাকৈবল্যের তালে তাল মেলান– রচনা করেন শূন্যগর্ভ, শব্দসর্বস্ব এমন কাবিতা যা 'না ঘর কা, না ঘাট কা'। বাংলাদেশের কবিতার প্রকৃত ধারার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই আবার সেগুলোকে উৎকৃষ্ট 'পোস্টমডার্ন' কবিতাও বলা যায় না। বস্তুত একটি উৎকৃষ্ট 'পোস্টমডার্ন' কবিতায়ও থাকতে পারে গাঢ় সংবেদনা, প্রস্তরীভূত বেদনা, ভীষণ জিজীবিষা, ক্ষমাহীন আয়রনি, অনন্য রূপকায়ন — কখনো কখনো তার 'লজিক্যাল ক্র্যাক'ও হতে পারে গভীর 'লজিক্যাল'। তখন সেটা পোস্টমডার্ন, কি মডার্ন তাতেও বিশেষ কিছু যায় আসে না। কিন্তু বাংলাদেশী এই উত্তরাধুনিক কবিদের কবিতাও প্রায়শই 'ক্লিশে'; শিল্পের নামে অহেতুক

শব্দ-ব্যয়। আশির দশকে মঈন চৌধুরী সম্পাদিত 'প্রান্ত' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত ছিলেন এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী কবিরা। বর্তমানে এঁরা গুণিতক হয়েছেন।

দূর পশ্চিমের সময়াকাশের মেঘাড়ম্বর আর দুই বাংলার কবিতায় তার অন্ধ পশ্চাদ্ধাবন খোন্দকার আশরাফ হোসেনকে স্পষ্টতই ভাবিত করেছে। কারণ, তিনি কেবল তত্ত্বানুসন্ধিৎসুই নন বরং যথার্থ দ্রষ্টা —

> এরকম গম্ভীর মহাকালচিন্তন আমাদের অনিকেত পরিবেদনার মধ্যে নিক্ষেপ করলেও আমরা যেহেতু কালগ্রন্থিতে অনড় ও অনিবার্যভাবে গ্রথিত, আমাদের ফিরতে হয় স্বদেশ ও স্বকালের অলাতচক্রের ভেতরেই।...বাংলা নামের যে দেশ আমাদের কোল দিয়েছে, বাংলা নামের যে ভাষা সৃষ্টি করেছে বিশ্বকে দেখার এবং অনুভব করার চেতনাপ্রপঞ্চ আমাদের মানসে, সেখানেই আমাদের প্রতিষ্ঠা ও পরিচয়, সে ভাষাতেই আমাদের জীবনচর্যার সব উপকরণকে বর্ণময় করে তুলি। আন্তর্জাতিকতা নামক বহির্বিশ্বের অবয়ব মূর্তি পায় আমার স্বদেশ ভাবনারই পাদপীঠে; বাংলা ভাষার দর্পণেই আমি দেখি বিশ্বমাতৃকার বিচিত্র রেখাঙ্কিত মুখ। [আশরাফ, ২০১০গ : ৫৭-৫৮]

নতুন শতাব্দীর শুরুতেই আশরাফ তাঁর কর্তব্য নির্ধারণ করেন — দায়িত্ব বোধ করেন বয়ঃসন্ধির মুগ্ধ বালকের মতো নিজ মেজাজ-মর্জিতে বয়ে চলা বাংলা কবিতার একান্ত অভিভাবকত্ব স্বীকারের — তাকে নতুন আধুনিক নান্দনিক সংশ্লেষণে ঐতিহ্যের অক্রমশ্রী ধারায় চালিত করার স্বপ্ন বুকে নিয়ে। ১৯৮৫ সালের নভেম্বর থেকে 'একবিংশ' হয় সেই স্বপ্নের রথ এবং সারথি স্বয়ং কবি। 'একবিংশে'র সূচনা সংখ্যার সম্পাদকীয়তেই তিনি তাঁর উদ্দেশ্যকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন —

> ...দৈশিক কবিতার হতাশাপূর্ণ বর্তমানই পত্রিকা প্রকাশের পেছনের মূল নিয়ামক ছিলো। মনকে চোখ ঠেরে লাভ নেই, বাংলা কবিতার এখন প্রখর দুঃসময়। ...বাংলার কাব্যক্ষেত্রটি বহুদিন প্রতিভারিক্ত আধিয়াদের অতীক্ষ্ণ ফলায় অপকর্ষিত হচ্ছে। অন্তর্গত শ্রীহীনতাকে ঢেকে রাখছে রাজনীতির শিল্পবোধহীন চিৎকার। আমরা একটি হট্টগোলের হাটে আছি। আত্মপৃষ্ঠকণ্ডুয়নের অসম্ভব যোগাভ্যাস, বামনাবতারদের কলহ, দলবাজি এবং স্বৈরাচারে অবরুদ্ধপ্রায় প্রাণের স্ফূর্তি, আবেগের আন্দোলন। (আশরাফ, ১৯৮৫ : ৩-৪)

৯০-এর দশকের অব্যবহিত আগে স্বৈরশাসন ও তার পতন-আন্দোলনের সাংঘর্ষিক সময়ে জন্ম নিয়ে অগণতান্ত্রিক শোষকের মদদপুষ্ট অপকবিদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের 'আল্টিমেটাম' দিয়েই অগ্রবর্তী হয়েছে 'একবিংশ' আর তার অবস্থান ছিল স্বস্থ কবিতার প্রতিটি প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে।

'একবিংশ' পত্রিকার পাতায় ১৯৮৯ সাল থেকে শুরু হওয়া 'পোস্টমডার্ন'-বিতর্ক লক্ষ করে, বিশেষত মার্চ ১৯৯২ সংখ্যায় প্রকাশিত অঞ্জন সেনের 'আশির কবিতা', 'গৃহে ফেরে ভ্রামণিক চোখ' পাঠপূর্বক অনেকেই খোন্দকার আশরাফ হোসেনকে এ দেশীয় 'পোস্টমডার্ন' কবিতার পথিকৃৎ বলে ভুল করে থাকেন। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে নজর দিলে তিনি স্বেচ্ছায় 'একবিংশ'র পাতায় এই উত্তরাধুনিক-বিতর্ককে কেন উস্কে দিয়েছিলেন তা বোঝা যাবে। যখন পশ্চিমবঙ্গের 'পোস্টমডার্ন' কবিরা দ্বিধাবিভক্ত, বাংলাদেশের তরুণ কবিদের

একাংশও তাঁদের 'গুরুভ্রাতাদের' অনুসারী, তখন বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বভাবতই তিনি ছিলেন উৎকণ্ঠিত — "একটি প্রজন্মের সকল কবি যখন শূন্যমার্গীয় কলাকৈবল্যের চক্ষুহীন উড্ডয়নে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, তখন কবিতার প্রাগ্রসরণ এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবিত হতে হয় বৈকি!" [আশরাফ, ২০১০গ : ১৬৪]। এই অবস্থায় 'কবিতার চৌকাঠে' দাঁড়ানো কবি-সমালোচকদের আত্মতত্ত্ব সমর্থন, পরস্পর-সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার মধ্য দিয়ে কবিতার কন্দরকে জাগিয়ে তোলা, যুক্তি-তর্কের মধ্য দিয়ে কবিদের চক্ষুষ্মান হয়ে ওঠার সময় দেয়া এবং সর্বোপরি বিশুদ্ধ কবিতার জন্মের আয়োজনই ছিল এর উদ্দেশ্য। নতুন কবিতা ও নন্দন প্রতিষ্ঠাই এর উদ্দেশ্য ছিল; বিশেষভাবে 'পোস্টমডার্ন' কবিতাকে পৃষ্ঠপোষকতা দান নয়। কবিতার জন্য উপেক্ষণীয় নয় — এমন সব তত্ত্বকেই তিনি উপস্থাপন করতে চেয়েছেন তাঁর পত্রিকায়। তবে, সময়ের নান্দনিক চাহিদা অনুযায়ী 'পোস্টমডার্ন' প্রতর্ক স্বয়ং অগ্রবর্তী হয়েছে কবি-সমালোচকদের বিতর্কের রেশ ধরেই। তাছাড়া, 'একবিংশ'র পাতায় কেবল 'পোস্টমডার্ন' তত্ত্ব নয়, সমকালীন সব ধরনের 'থিয়োরি' — সমন্বয়ক এমনকি পরস্পর বিরোধাত্মক তত্ত্বগুলোকেও উৎসাহিত করা হয়েছে যেমন, 'পোস্টমডার্নিজমে'র পাশাপাশি ধারাবাহিকভাবে অনূদিত হয়েছে টেরি ঈগলটনের সাহিত্যতত্ত্ব; আলোচিত হয়েছে এডওয়ার্ড সাঈদের 'ওরিয়েন্টালিজম'। প্রকৃতপক্ষে, যে কোনো কবিকেই আবিষ্কার করে নিতে হয় তাঁর আত্মপরিচয়, আত্মস্বভাব ও নিজস্ব রীতিকে। কোনো কবি, তিনি যে কালেরই হন, যে তত্ত্বেরই অধীন হন না কেন, আত্মজ্ঞান ও বোধি তাঁর জন্য অপরিহার্য, যার মধ্য দিয়ে তিনি খুঁজে নেন কবিতায় তাঁর স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা। তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য গোষ্ঠীর প্রয়োজন হয়, কিন্তু প্রত্যেক কবিকে অবশ্যই অর্জন করতে হয় তাঁর নিজত্ব। তত্ত্বজগৎ তাঁকে ভ্রামণিক আনন্দ দান করতে পারে, প্রজ্ঞার সহায়কও হয় কখনো, কিন্তু তা কবির গভীরতর প্রব্রজ্যার অংশ নয়। তত্ত্ব-পৃথিবী কবির অভিজ্ঞতার সহায়ক, কিন্তু কবিতার জননানন্দ-বেদনার দায়ভার তত্ত্ব কখনো নেয় না। 'একবিংশ' পত্রিকার বিতর্কের উদ্যোক্তা কেবল একজন সম্পাদক নন বরং মনে প্রাণে একজন কবি। তাই 'একবিংশে'র পাতার 'পোস্টমডার্ন'-বিতর্কের সূত্র ধরে খোন্দকার আশরাফ হোসেনকে উত্তরাধুনিকতায় তদ্‌গতচিত্ত ভাবার অবকাশ নেই। 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুর সাথে 'একবিংশে'র সম্পাদকের পার্থক্য এই যে, বুদ্ধদেব বসু সমর্পিত হয়েছিলেন আধুনিকতাবাদে এবং মূলত তাকেই প্রতিষ্ঠা দেবার লক্ষ্যে আধুনিক কবিদের একত্র করেছিলেন তাঁর পত্রিকায় কিন্তু খোন্দকার আশরাফ হোসেন প্রথম থেকেই কোনো মতবাদে স্পৃষ্ট না হয়ে নিরপেক্ষ, উদার চেতনা নিয়ে নতুন শতকের কাব্যভাবনাকে দলমত নির্বিশেষে স্থান দিতে চেয়েছিলেন। সময়ের সাথে সাথে নতুন প্রথাবিরোধী কবিরা যখন কবিতার স্বায়ত্তশাসনকে অগ্রাহ্য করে চলেন তখন সন্তর্পণে 'একবিংশ'কে আশ্রয় করে তাঁদের সুচেতনাকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন তিনি। নতুন কবিরা যেন জেনে-বুঝে তাঁদের নিজ নিজ জগৎ চিনে নিয়ে আশ্বস্ত হয়, অগ্রজ কবি হিসেবে এই তাঁর কাঙ্ক্ষিত ছিল। পরস্পর সমালোচনা ও গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে যদি একাধিক কবি কোনো বোধের স্বস্থতায় মিলিত হয়ে থাকেন, তবে তাই ছিল 'একবিংশে'র সার্থকতা — যেমন আত্মিক সাদৃশ্যের সন্ধানে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-আধুনিক কবিরা চিনে নিয়েছিলেন বাংলাদেশী সমসাময়িক কয়েকজন প্রতিশ্রুতিশীল কবিকে। ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে এইরকম মৈত্রী যদি

বাংলা কবিতার 'বন্ধনহীন গ্রন্থি'কে সুদৃঢ় করে থাকে, তবে তাই ছিল সম্পাদকের অর্জন। সর্বোপরি, বাংলাদেশের কলাকৈবল্যবিহারী কবিরা যেন আধুনিকতার প্রকৃত অর্থ খুঁজে পেয়ে এদেশের কবিতার মূল ধারায় নিজেদের সংযুক্ত করেন, বড়জোর এইটুকুই উদ্দেশ্য ছিল খোন্দকার আশরাফ হোসেনের; উত্তরাধুনিকতাকে উস্কে দেয়া নয়।

বাংলা কবিতার উত্তরাধুনিক এই গড্ডলিকায় যখন সমালোচক মাত্রেই 'ট্রেডমার্ক' হাতে বসে থাকেন, কোনো কবির গায়ে কী তক্‌মা লাগাবেন, তখন কবিতার অমিশ্র বিশুদ্ধতাই বিপন্ন হয়ে পড়ে। খোন্দকার আশরাফ হোসেন জীবদ্দশাতেই এ প্রবণতার সাক্ষী—

> যাঁরা এই কাল্টের (পোস্টমডার্নিজম) পরহেজগার তথা সনিষ্ঠ চর্চাকারী তাঁরা খোঁজ-খবর করে জানছেন দুই বাংলার (আসলে বলা উচিত বাংলাদেশ এবং অ-বাংলাদেশ বঙ্গভূমির) কোন্ কোন্ কবিতালেখকের মধ্যে এই সাধারণ লক্ষণগুলো নজরগোচর হচ্ছে; কাদের বসনে দেখা যাচ্ছে গৈরিক ছোপ; কাদের চুল চুড়ো-করে বাঁধা মাথার ওপরে; কার হাতে গুবগুবি অথবা আড়বাঁশি। সব লক্ষণ মিলবার দরকার নেই; দুটো একটা মিললেই আমরা কাউকে গোষ্ঠীভুক্ত করে নিচ্ছি, কপালে চন্দন-বাটা দিচ্ছি মেখে, মুখে বলছি; সাধু! সাধু! [আশরাফ, ২০১০গ : ১৪২]

খোন্দকার আশরাফ হোসেন যেন তাঁরই চিহ্নিত ঘেরাটোপে নির্বিচারে বন্দি না হন, সে উদ্দেশ্যেই এ প্রবন্ধ রচিত। সংরক্ষণশীল বা ছুৎমার্গগামী তিনি কখনোই ছিলেন না, কিন্তু যেমন সত্যদ্রষ্টাকে অনেক অপ্রিয় সত্য উচ্চারণ করতে হয়, তিনিও তেমনি করেছেন দুই বাংলার 'পোস্টমডার্ন' কবিদের সম্পর্কে।

পশ্চিমা 'পোস্টমডার্ন' কবিতা ও তার অন্ধ অনুসারী বাঙালি কবিদের খোন্দকার আশরাফ হোসেন যে স্বাগত জানাননি, তার কারণ কোনো তাত্ত্বিক রক্ষণশীলতা বা অতিনন্দনগ্রহিতা নয়। নান্দনিক বোধের ধী নিয়ে দেশ-কাল-ঐতিহ্য-সংস্কৃতিকে সাথে করে পরিপূর্ণ জীবনশ্রীসহ যে নতুন আধুনিকতাকে তিনি কবিতায় আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন, উত্তরাধুনিক প্রপঞ্চ তার অন্তরায় — অন্তত সমধর্মী নয়। বিমানবায়নকামী, 'থিয়োরি'সর্বস্ব কবিদের 'পাঠক পাঠ-প্রতিক্রিয়াতত্ত্ব'কে (reader response theory) সৃষ্টিশীলতার অন্তরায় বলে মনে হয়েছিল তাঁর কাছে —

> কবি-টেক্সট-পাঠক এবম্প্রকার প্রপঞ্চ নিয়ে আজকের দিনের সাহিত্যচিন্তনের জগৎ। এই তত্ত্বালোচনার যাঁরা কুশীলব, তারা প্রায়শই সৃষ্টিশীল লেখক-কবি নন। এক স্বয়ম্ভু, স্বনাভিমূল-নিমগ্নদৃষ্টি অদ্ভুত প্রজাতির পণ্ডিতদের খবর নিশ্চই সকলের জানা, যারা সাহিত্যকে নয় সাহিত্যতত্ত্বকেই করেছেন জীবনের ধ্রুবতারা। [আশরাফ, ২০১০গ : ৩১]

খোন্দকার আশরাফ হোসেন পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যাশ্রয়ী উত্তর-আধুনিকদের কিঞ্চিৎ প্রশ্রয়ের চোখে দেখেছিলেন, কারণ তাঁরা অন্তত ঐতিহ্যের সাথে সংযুক্তি চেয়েছেন — কবিতাকে সর্বদাই মানববর্জিত, শব্দসমাহার মনে করেন নি। এই কবিদের নতুন নিরীক্ষাকে তিনি বাৎসল্যের চোখে দেখেছিলেন ঠিক যেমন 'জলকাব্য' কবিতায় কবির নগরবাসী নন্দিনী নদী দেখে বিস্মিত হয়ে জলে নামার বায়না করলে সমূহ বিপদ জেনেও সম্মতি জানান কবি, তেমনি —

আমার মেয়েটা গোঁ ধরেছে জলে নামবেই।
...ওকে বোঝাই জলের
বিপদ, সাঁতার না-জানার তাবৎ জুজুর ভয়
দু'হাতে উড়িয়ে দিয়ে জলে নামলো সে,
জল ছিটাল সারা গায়ে; কাদামাখা দুটো পা,
জামাতে মাটির সুগন্ধ। ওর চটিজুতা দুটো
আমার পকেটে। ওকে দেখি, আর ভাবি কতকাল
ও হয়তো নদীটির কাছে আসবে না, জানবে না
একদিন জলসিঁড়িটির তীরে হলুদ ময়নার ঠ্যাঙ
দেখে দেখে বাংলাকে রূপসী ভেবে আহ্লাদিত হয়েছিল
কোন এক কবি; নিহিত কাদার মধ্যে ভোঁদড়ের
পদচ্ছাপ দেখে তার বাবা ভুলে গিয়েছিল পিকাসোর
রঙতুলির টান। ঘরে ফিরি আমাদের নিত্যানন্দ
কেবল-কৈবল্যধামে; আমার মেয়েটি কিছুতেই
ধোবে না কাদামাখা পা। আর কার্পেটে, গদিতে
পদচিহ্ন এঁকে গেল তার, ঠিক যেন উদবিড়ালের
পায়ের ছাপ। আমি জানি সেও আমার মেয়ে
একইভাবে বিপন্ন এই চড়া পড়া নিসর্গে, নদীতে।
[আশরাফ, ২০১০ক : ২১০-২১১]

নিসর্গের মতো বিপন্ন আত্মজা আর আত্মজার মতো ঐতিহ্যমুগ্ধ নতুন কবিদের ইচ্ছাকে মুক্তি দিলেও আশরাফের মন পড়ে থাকে পেছনে — কবেকার নদী অববাহিত পাললিক জীবনের প্রতি। 'ইয়ামাহা ইঞ্জিনের ধুকপুক/ জলের অন্তর্দাহ', 'অস্ত্র হাতে' বসে থাকা মানুষের ভিড়ে কবি যেন সেই 'জীবনানন্দের চিল' — পাঁচ দশক পরে ফিরেছেন বাংলার মাঠে, ঢেউয়ে 'ইউরিয়া পটাশের গন্ধমাখা' ধানসিঁড়ির তীরে। আশরাফ যেন নদীর মোহনায় দাঁড়িয়ে দেখছেন সামনে জোয়ারের উচ্ছল তটে আছড়ে পড়ছে নতুন ঢেউ, পেছনে শান্ত-গভীর নদী দূরে মিলিয়ে যায় — তার তটরেখা দেখা যায় না — সেখানেই আমাদের কাব্য-নদীটির শুরু — সে নদী সাঁতরেই তিনি মোহনায় উপনীত। তাই, আধুনিকতার গজদন্তমিনারে বসে থাকার ইচ্ছে যেমন ছিল না, তেমনি উত্তরাধুনিকদের মতো আধুনিকতাকে ভ্রষ্ট ও অকেজো বলে সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্যও ভাবেননি আশরাফ। আধুনিকতাবাদের ঐতিহ্যবিমুখ, অহংসর্বস্ব, আত্মচংক্রমণকে যেমন 'পোস্টমডার্নিস্ট'রা পরিহার করেছেন, ঠিক তেমনি আধুনিকতার 'সদ্‌গুণগুলো' তাঁদের চলার পথে সমন্বিত হবে, এটাই কাঙ্ক্ষিত ছিলো তাঁর —

প্রশ্ন উঠবে, 'আধুনিকতার' সদ্‌গুণ তাহলে আছে? আমি বিশ্বাস করি, আছে। আধুনিকতাবাদ মানুষের সামাজিক-আত্মিক প্রাগ্রসরণেরই একটি স্তর (অনেকটা যেমন মার্কসবাদীরা বুর্জোয়া চেতনাকে সমাজবাদী চেতনার একটি প্রয়োজনীয় স্তর বলে মনে করেন); মানুষের শিল্পসাহিত্য সৃজনক্ষমতায় সে যোগ করেছে একটি নতুন দীপ্রতা ও মাত্রা। আধুনিকতা চিন্তায় পরিশীলন ও উদারতার মাত্রা যোগ করেছিলো। [আশরাফ, ২০১০গ : ১৬৪]

বাংলার ঐতিহ্যের অনুজতম উত্তরাধিকারী উত্তর-আধুনিক কবিরা নিজেদের ঐতিহ্যের সবচেয়ে নিকটতর বলে মনে করেন — যেন ঐতিহ্যের ঝাঁপিকে আগলে রাখতে সংগ্রামে মেতেছেন, যদিও ঐতিহ্যের সাথে তাদের চেনা-জানাই হয়নি এখনো ভালো করে আর ঐতিহ্য, স্বাধীনতা — এসব কারো নিজস্ব সম্পত্তিও নয়। এগুলো কবিতার চিরকালের সম্পদ। এমনকি আধুনিক কবিরা জেনে-শুনে সেগুলোকে কবিতায় বর্জন করেছেন বলে ঐতিহ্যচেতনা তাঁদেরও ছিল না — একথা সত্য নয়। বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা তার দৃষ্টান্ত। 'পোস্টমডার্নিজম'-সমালোচক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেন —

> শিকড়ের সঙ্গে লগ্ন তো সব তাৎপর্যপূর্ণ কবিকেই হতে হয়, এটা উত্তর-আধুনিকের শুধু বৈশিষ্ট্য হবে কেন? বরঞ্চ কেমন যেন মনে হচ্ছে গ্রমীণ শিকড়ের কথা বললেও, উত্তর আধুনিকরা লোকপরম্পরা লোকজ উৎসকে পাত্তা দেননা : এক ধরনের আর্কেইজম-এর দিকে ঝোঁক আছে। আসলে বৃহত্তর সংকটের এটা প্রকাশ। [পার্থপ্রতিম, ২০০৭ : ৪৪]

ফলে, উপনিবেশবিরোধিতার সূত্রে উত্তর-আধুনিকদের এই ঐতিহ্যাশ্রয়কে কখনো কখনো উপনিবেশিতের অভিমানজাত বলে মনে হয়, নইলে 'পোস্টমডার্ন' বললে তাঁরা কুপিত হন, অথচ এক ঐতিহ্যপ্রেম বাদে 'পোস্টমডার্নিজমে'র প্রায় সব লক্ষণকেই আত্মস্থ করেছেন। অঞ্জন সেন ও অমিতাভ গুপ্তের অনুমতি ও উৎসাহ সাপেক্ষেই (গ্রন্থের সম্পাদকীয়তে বিবৃত) এঁদের ভাবাদর্শে বিশ্বাসী নিতাই জানা সম্পাদিত *পোস্টমডার্ন বাংলা কবিতা* (২০০৭) গ্রন্থে প্রতিনিধিত্বস্থানীয় কিছু উত্তর-আধুনিক কবিতা সংকলনের পর গ্রন্থের শেষভাগে — অনুপস্থিতি (Absence), মানবায়ন (Anthropolization), অর্ধনারীশ্বর/ বহুরূপী (Androgynous/ Polymorphous), প্রতিআখ্যান (Antinarrative), বিরোধ (Antithesis), রূপাদক্ষ (Bricolage), অবিনির্মাণ (Deconstruction), মন্তাজ (Montage), আত্মপ্রতিফলন (Self reflexivness) — এইরূপ অসংখ্য 'পোস্টমডার্ন' সংলক্ষণের বৈশিষ্ট্য টীকাকারে সংযুক্ত হয়েছে তো সংকলিত কবিতাগুলোর মর্মোদ্ধারের জন্যই [নিতাই, ২০০৭ : ১১০-১৩০]। তাহলে, এতগুলো 'পোস্টমডার্ন' লক্ষণ দিয়েই যদি পশ্চিমা 'পোস্টমডার্ন'-বিদ্বেষী উত্তর-আধুনিক কবিদের কবিতা বুঝতে হয়, তবে তাঁদের উপনিবেশবিরোধী চেতনাকে অভিমান বলেই মনে হওয়া যথাযথ। আর হয়ত উত্তরকালে নতুন কোনো আধুনিক কবিগোত্রের মনে হতে পারে — বাংলা কবিতার উত্তর-আধুনিকেরা আসলে 'পশ্চিমী উত্তর-আধুনিক' — ঠিক যেমনভাবে তাঁদের সমালোচনায় প্রশ্নবিদ্ধ আজ ত্রিশোত্তর আধুনিক কবিরা। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভিক্ষাবৃত্তি' বলেছেন এই উত্তর-আধুনিক প্রবৃত্তিকে —

> উত্তর-আধুনিকতা পশ্চিমের ইতিহাসের পরিবর্তন ও বদ্ধতা, উভয়ের হাত ধরা। আমরা তার দুয়ারে ভিক্ষা নিতে যাই — আমাদের উত্তর-আধুনিকতার মোহ ঐ ভিক্ষার চাল। ঐ চালে তো পেট ভরবে না, বাঁচাও যাবে না। এ এক অব-ঔপনিবেশিক মায়া — এ মায়ার দেশ নিরুদ্দেশ। [পার্থপ্রতিম, ২০০৭, ৬৩]

প্রকৃতপক্ষে, যে কোনো প্রত্নপ্রিয় কবি ঐতিহ্যের আলো-হাওয়া-জলে বেড়ে ওঠেন, প্রয়োজন মতো ঐতিহ্যের উপাদানকে আধুনিক চেতনার সাথে সমন্বিত করেন কবিতায় — নতুন কোনো দর্শনে, নিজস্ব আঙ্গিকে। কিন্তু ঐতিহ্যবোধের সমগ্রতা না থাকায় উত্তর-

আধুনিক কবিরা প্রায়শই ঐতিহ্যের সাথে শিল্পের মায়াময় সম্পর্ককে অনুভব করতে পারেন না — ছুটে যান লালনের কাছে, *চর্যাপদে*, *মনসামঙ্গলে*। কিন্তু, স্বাভাবিকভাবেই ঐতিহ্যের সাথে তাঁদের সম্পর্কের দূরত্ব ইতোমধ্যে এত বেড়েছে, যে তার সম্পূর্ণ স্বভাবকে না জেনে উপরিতলের টুকরো টুকরো উপাদানকে আবিষ্কার করেই তাঁরা কৃতার্থ বোধ করছেন। সেগুলোকে কবিতায় কোন নন্দনের মালায় গেঁথে তোলা যায়, তা জানা নেই বলে তাঁদের কবিতা প্রায়শই ভুরি ভুরি ঐতিহ্যের উল্লিখন মাত্র। প্রকৃতপক্ষে, শেকড় খুঁজতে পেছনে ফেলে আসা ঐতিহ্যের বিশাল অরণ্যে টুকরো টুকরো অনুষঙ্গই খুঁজে পাওয়া যায়। সেই কুড়িয়ে আনা কুটো-কাটা জড়ো করে কবিতা রচনা করলে — 'ফুল্লরা', 'বেহুলা', 'কপালকুণ্ডলা'কে একত্র করে কবিতায় স্থান দিলেই ঐতিহ্যাশ্রয়ী কবিতা হয় না। খোন্দকার আশরাফ হোসেন তাঁর এক সাক্ষাৎকারে বলেন —

> আমার যেটা ধারণা সেটা হচ্ছে যে তরুণরা যা করছে তা বোঝাই যায় — যে পুঁজিপাট্টা কম হলে বাপ-দাদার সিন্দুক ভেঙে সেটা খাটিয়ে যদি কিছুদিন বাঁচা যায়। এজন্য তারা অনেকে করছে কি, দেখবেন যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লালন সাঁই এবং হাছন রাজার গানগুলোর কথা উল্টিয়ে পাল্টিয়ে প্রকাশ করেন। তাতে দৈন্যই প্রকাশ পাচ্ছে। [নিসর্গ, ২০১৪ : ২০৮]

প্রকৃতপক্ষে, শেকড়ের সন্ধানে ঐতিহ্যের বনে পথ হারানো নয়, বরং শেকড় থেকেই উঠে এসে বার বার জীবনের নানা বিপন্নতায় মনে করতে হয় শেকড়ের কথা। জীবন যত আধুনিক হবে, ঐতিহ্যের রোমন্থনও তত বাড়বে — ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কও হবে তত গভীর। বৃক্ষের অগ্রভাগ ঊর্ধ্বে থাকে বটে, কিন্তু তার পুষ্টি আসে শেকড় থেকেই। আর সব মিলে ক্রমাগত যে সালোক-সংশ্লেষণ, তাই তার প্রাণের প্রক্রিয়া — কবির ঐতিহ্যচেতনার রহস্য। খোন্দকার আশরাফ হোসেনও এই চিরন্তন ঐতিহ্যচেতনায় বিশ্বাসী।

এক

উপনিবেশবিরোধী চেতনার অভিঘাতে জন্মানো উত্তর-আধুনিকদের চর্চিত ঐতিহ্যপ্রেম আর খোন্দকার আশরাফ হোসেনের ঐতিহ্যপ্রীতি সমরূপ নয়। আশরাফের ঐতিহ্যচেতনা এক নাছোড়বান্দা 'নস্টালজিয়া', যা নাগরিক জীবনের ঘূর্ণাবর্তে হঠাৎ শূন্যতায় থমকে যাওয়া কবিকে মনে না করিয়ে পারে না যে, শৈশবে হাটের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি বহুদিন আগে —

> শৈশবে হাটের কোণে দাঁড় করিয়ে যেতেন বাবা
> আনাজের দরদাম, আমিষের, অম্লতার খোঁজে। মনে হতো
> কতো কাল এখানে দাঁড়ানো আছি, বাবা আসছেন না, আসছেন না
> মনে হতো কি অচেনা প্রতিটি লোকের মুখ, কি অজানা স্নেহহীন
> প্রতিটি মানুষ!
> আজ এই জীবনের হাটপ্রান্তে আমাকে কে দাঁড় ক'রে গেলো?
> কবে তিনি আসবেন? আমার প্রতিটি দিন কি অচেনা দিন,
> আমার প্রতিটি রাত রাতের পাখির মতো শুধু জেগে থাকে,
> আমার এ চুল থেকে ধুলো হয়ে উড়ে যায় ধূলি ও কুয়াশা।
> [আশরাফ, ২০১০ক : ১২]

কবির নাগরিক জীবনের বর্তমান শূন্যতার প্রতিরূপক হয়ে ওঠে শৈশবের হাটের সেই নিঃসঙ্গতার স্মৃতি। এক অভিন্ন একাকিত্বে নগর আর গ্রাম, সেকাল ও একাল, শৈশব আর উত্তর-জীবন একাকার হয়ে যায়। নাগরিক জীবনের ব্যস্ততা, বদ্ধতা, শূন্যতার নানা সংকটে ঐতিহ্য ছিল আশরাফের বেঁচে থাকার অমূল্য অম্লজান — স্মৃতি ছিল সহোদরার মতো সুখ-দুঃখের সাথী। যতবার তিনি অসহায় ও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন, থমকে দঁড়িয়েছেন জীবনের পথে — যতবার নিজেকে অভিশপ্ত মনে হয়েছে, ততবার তাঁর মনে পড়েছে 'বান্নির মেলা'তে দেখা সেই বাঁশিওয়ালার কথা, যে আসবে বলে আর আসেনি কোনো দিন (পিরহান উঠালে তার গোল ছাপ, *কবিতাসংগ্রহ* : ২৩), যতবার তিনি 'গোডোর মহান ভ্রাতা'র জন্য অপেক্ষা করতে করতে নিঃসহায় হয়ে পড়েছেন, ততবার তিনি ফিরে গেছেন ঐতিহ্যের বাস্তুভিটায় —

> হিচহাইকিং করে কত লোকে চলে গেলো দূরতম গন্তব্যে, তবুও
> আমি একা এখানে দাঁড়িয়ে আছি
> বাসভাড়া হয়েছে লোপাট অন্য কারো কলাবতী আঙুলের হাতে —
> তবু আমি বাড়ি যাবো, বাড়ি যাবো, বাড়ি
> এ বিশাল পৃথিবীতে এ মুহূর্তে অন্য কোনো গন্তব্য তো নেই।
> পথ ছাড়ো অন্ধকার, পথ ছাড়ো দূরত্বের দূরগামী পথ
> বাড়ি যাবো, বাড়ি। [আশরাফ, ২০১০ক : ৪৫]

ঐতিহ্যের সান্নিধ্যে ছিলেন বলে 'অ্যাবসার্ডিটি' নামক অচিকিৎস্য 'অ্যাসিডিটি' তাঁর কোনোদিন হয়নি। আশরাফ প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন। তিনি জানতেন — "বাংলাদেশের আটানব্বই ভাগ গ্রাম; তিন ভাগ জলের পৃথিবীর মতো এর তিনভাগও জলে গড়া। নদী ও খাল বিল-ঘেরা ঝঞ্ঝাতাড়িত বন্যাশাসিত গ্রামীণ এই ভূখণ্ড' — এমনকি "খোদ ঢাকা শহরের প্রসাধিত মুখচ্ছবির নিচেই গ্রামীণ মানুষের মুখটি এখনো জীবন্ত" — ফলে এই ভূখণ্ডের কবিতা সর্বাংশে নাগরিক হওয়ার সুযোগ নেই [আশরাফ, ২০১০গ : ৮০]। তাই, হনুমানবের মতো নাগরিক-আধানাগরিক কবিদের নকল করে 'আমবিভ্যালেন্স' ভরা নাগরিক বিষাদের কবিতাকেই আদর্শ বলে ভাবেননি তিনি। মৃত্তিকার আলো-হাওয়া-গন্ধের চিরচেনা 'এসেন্স' দেহ-মনে মেখে নিয়ে আশরাফ হাঁটতেন এই নগরীর পথে পথে — ঐতিহ্যের পুঁজিপাটা' বুকের ভেতর নিয়ে ঘুরতেন — প্রয়োজন হলেই বাপ-দাদার রেখে যাওয়া সিন্দুক খুলে বেছে নিতেন পছন্দমতো সোনালি-রূপালি সিকি আর আশরফি।

সেসব পুরনো সোনা ভেঙে নিজের মনের মতো করে গড়ে নিতেন নতুন মুদ্রা, নতুন কালের জন্য। আর এভাবেই তো ঐতিহ্যের প্রতিপত্তি বাড়ে — তৈরি হয় পরম্পরা। ঐতিহ্য ও আশরাফ অনন্য দোসর বলে দূর প্রবাসে, অক্সফোর্ডশায়ারের আকাশে ওঠা রঙধনুতে বাংলাদেশের 'রূপভানে'র রঙিন মুখ ভেসে ওঠে — স্মৃতিতে জেগে ওঠে কবির শৈশব, কৈশোর —

অকস্মাৎ চোখে পড়ে দিগন্তবিস্তার ধনু,
আকাশের ভুরু যেন নাটকে সেজেছে রূপভান;
... ...
আহা শেষ বিকালের মাঠে শালুক খোঁজার ছলে
দেখি নাই কতকাল রঙধনু ।
[আশরাফ, ২০১০ক : ২৩০]

যেন এক প্রগাঢ় মমতায় ঐতিহ্য ছুটে আসে তাঁর দিকে, তিনি বালকের মতো ছুটে যান ঐতিহ্যের দিকে। এ দ্বৈতাদ্বৈত বিধি মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সঙ্গী ছিল — তাঁর যাপিত জীবনের অংশরূপে। তাই, হাসপাতালের বিছানায় শুয়েও সাদা আলখাল্লা পরা ডাক্তারের চোখ ফাঁকি দিয়ে 'সুররিয়াল'-নৈপুণ্যে তিনি চলে যান ঘুমের বিছানা পাতা তাঁর কাঙ্ক্ষিত ঘরে; ঐতিহ্যের নিলয়ে —

তাঁর সাদা আলখাল্লা সহসা উড়াল দিলো মেঘের ভেতর,
স্টেথিস্কোপ এক হাতে, অন্য হাতে জপমালা বাঁচাও, বাঁচাও।
ধমনীর আরক্ত উচ্ছ্বাসে তিনি ডুবে যান স্বখাত সলিলে
আমার চোখের সামনে ক্লিনিকের পর্দা ওড়ে, আর তার চোখ
খুলে নিয়ে শিরীষের ডালে বসে মাছরাঙা পাখি।
আমি তার মুখের সৌন্দর্য থেকে এক লম্ফে পৌছালাম ঘরে
যেখানে আমার জন্য ঘুমের বিছানা পাতা, যেখানে শস্যের
আলের ভেতরে নম্র এক চাষী বউ আমাকে শোনালো
বেঁচে থাকো, আগামী অঘ্রানে হবে নবান্নের ভোজ,
তুমি এলে জমবে গাঁজন ভালো, পুঁথিপাঠ কড়ুইতলায় —
'শাওনে আসিস তুই', হেঁকে গেলো মাছরাঙা পাখি।
[আশরাফ, ২০১০ক : ১৪৭]

খোন্দকার আশরাফ হোসেন চিরন্তন ঐতিহ্যচেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন বলে 'পোস্টমডার্ন' কলাকৈবল্যবাদীদের মতো জীবন-সমাজ-ধর্ম-ইতিহাস-রাজনীতিকে উপেক্ষা করেননি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার নানা অসঙ্গতিকে ছড়া-গান-গাথা-গীতিকা-পুরাণ সমবায়ে উপস্থাপন করেছেন কবিতায়, অনন্য আধুনিক কৌশলে। লখিন্দরের মতো মৃত্যু-ঘুম থেকে উঠে তিনি বেহুলারূপী বাংলাদেশকে ভর্ৎসনা করেছেন, অভিসম্পাত দিয়েছেন বহু বেদনার গরলে বিষ-জর্জর হয়ে। আবার তার ম্লান, সন্তপ্ত মুখ ভালোবেসে আশীর্বাদ করেছেন তাকে — 'আলোর সুতীব্র ঘাতে পুনরায় গর্ভবতী হও' ['বেহুলা বাংলাদেশ', *কাব্যসংগ্রহ* : ১৩৩] । অবক্ষয়িত দেশের বধ্যভূমি থেকে অসংখ্য কৈফিয়ত চেয়ে জেগে ওঠা শহীদদের 'তেত্রিশ করোটি'র দন্তহীন আকর্ণবিস্তারী উপহাস আর তাঁদের 'ছেষট্টি হাতের হাড়ে'র 'প্রবুদ্ধ কাটারি' ক্ষমাহীন জিঘাংসায় তাঁর দিকে তেড়ে এলে ভয়ার্ত, বিহ্বল কবি 'কঙ্কাবতী'কে ডেকে শোনান তাঁর বিপন্নতার কথা —

দেখে যাও কঙ্কাবতী তোমার সোনার
বাংলাদেশে হাড়ের বিশাল খনি পাওয়া গেছে :
নারী পুরুষের খুলি, জঙ্ঘা ও চোয়াল

ন'হাত মাটির নিচে, জলের তোড়ের নীচে
স্তবকে স্তবকে রাখা মানুষের অস্থিসমুদয়
ওগো কঙ্কাবতী।
...একসাথে হেসে ওঠে তেত্রিশ করোটি,
ছেষট্টি হাতের হাড় প্রবুদ্ধ কাটারি হয়ে
বিদ্ধ করে আমার পাঁজর —
কঙ্কাবতী, আমি কি পালাব?
[আশরাফ, ২০১০ক : ২২৬-২২৭]

ফতোয়াবাজ, মৌলবাদীদের নিক্ষিপ্ত পাথরে নিহত সিলেটের কৃষককন্যা নূরজাহানকে নিয়ে লেখা কবিতাটি লোকজ ভঙ্গিতে করুণ, হৃদয়দ্রাবী ও পরিতপ্ত — উপহাস করে আমাদের মৌলবাদী চেতনার যুক্তিহীন পাষাণ-কারাগারকে —

উনুনে রান্না হচ্ছে জল
জলের ভেতর কী?
পাথর গো পাথর।
আমরা কি পাথর আহার করবো গো মাওলা
আমরা কি উষ্ণ প্রস্রবণে গোসল করব গো মাওলা
আমরা উনুন হয়ে জ্বলবো, জল হবো তোমার ক্রোধে
আগুন হবো নমিত শোকের মতো, পাথর হবো
জলের ঝর্ণায় পড়ে থাকা নুড়ি কিংবা যমযমের কুয়া?
উনুনে রান্না হচ্ছে জল
জলের ভেতর কী?
নারীর হৃৎপিণ্ড গো, তার শাড়ি।
[আশরাফ, ২০১০ক : ১৬৮]

যত দিন গেছে, ঐতিহ্যের সাথে আশরাফের সম্পর্ক হয়েছে তত গভীর — শেষের দিকে তা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছিল তাঁর কবিতার কথায়, কাঠামোয়, ভাষাতে, ভঙ্গিতে — সমস্ত অস্তিত্বে। 'যমুনা পর্ব'থেকে ঐতিহ্যচেতনা তাঁর নন্দন স্বভাবে পরিণত হয়। 'সদানন্দের পদাবলী'তে প্রাচীন 'ফর্মে' নিজেকে নিয়েই 'স্যাটায়ার' করেছেন কবি। কবিতাটির বিষয় ও ভাষার কৌতুকময়তার ভেতর নিহিত আছে আশরাফের জীবনের অনেক সত্য উপলব্ধি ও বিশ্বাস, কাব্যজীবনের চড়াই-উৎরাইয়ের নানা স্বীকারোক্তি এবং বর্তমানে বসে ভবিষ্যতের চোখে ভূতপূর্বকে দেখার কৌতুক। কখনো আরবি-ফার্সি, কখনো বাংলায় এই পদগুলাতে তামাশা করেছেন নিজেকে নিয়ে আর সমসাময়িক ও উত্তরাধুনিক কবিদের নিয়েও —

আহারে ছন্দের গান বিভল পীরিতি
উঠলো গাঙের মাঝে রসের তুফান
কে কবি কে কবে মোরে আধুনিক রীতি
উত্তর দক্ষিণ পূর্ব, নাকি বিনির্মাণ?
সদানন্দ ভনে কানু কিবা কাল ভৈল
হৃদয়ে পদ্মের ডাঁটা যেনবা মৃণাল

রোহিত মৎস্যের ঝাঁকে মিশে যায় শৈল
এবং খলিসা পুঁটি ঊর্ধ্বে দেয় ফাল।
[আশরাফ, ২০১০ক : ২২১]

তবে, লোকজ ভাষায় কবিতা লেখা মানে প্রচুর আঞ্চলিক ভাষার শব্দ ও ক্রিয়াপদের ব্যবহার ঘটানো — তা মনে করেননি আশরাফ হোসেন। 'পোস্টমডার্ন' কবিরা যেমন কবিতায় সামাজিক ভাষা (social language) ব্যবহার করতে গিয়ে অনর্গল আঞ্চলিক, সাধু বা 'কথ্য' শব্দের ব্যবহার করে থাকেন, ঠিক তেমনভাবে নয়। মূলত, সাধারণ মানুষের ভাবপ্রকাশের ভঙ্গিকে এবং তাদের জীবন-ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গির লৌকিক রূপকেই নিরীক্ষা করতে চেয়েছেন আশরাফ তাঁর এ ধরনের কবিতায় [নিসর্গ, ২০১৪, ২০১]। ঐতিহ্য থেকে জীবন ও জীবন থেকে ঐতিহ্যে গমনাগমন করেছেন বলে লোকজ ভাষার স্তবকের পাশাপাশি প্রমিত ভাষার স্তবকও বসিয়েছেন অনেকক্ষেত্রে। *যমুনাপর্বের* নাম কবিতা, 'কৈবর্ত পুরাণ', 'সদানন্দের পদাবলী' এবং আরো অনেক কবিতায় তার দৃষ্টান্ত আছে।

তাই, খোন্দকার আশরাফ হোসেনের ঐতিহ্যচেতনা 'ফাস্টফুডে' অভ্যস্ত 'টিনএজার'দের একদিনের পিঠা-উৎসবের বিলাসিতা নয়, নাগরিক ক্লান্তি কাটিয়ে ওঠার জন্য কয়েকদিনের পল্লিভ্রমণের মুগ্ধতা নয়, একবেলা আখড়ায় গান শুনে বাউলিয়ানায় ভাসা নয়। পোস্টমডার্নিস্টদের নব্যবাউল স্বভাবের সাথে তাঁর জন্মবাউল চরিত্রের ব্যবধান বিস্তর। কৈবর্ত্যের সন্তানের মতোই ইতিহাস-ঐতিহ্যের মধ্যে তাঁর জন্ম — মারী আর মড়কের সাথে যুদ্ধ করে বেড়ে ওঠা– তারপর 'আর্যাবর্তের' সাথে পরিচয় শেষে ফিরে আসা আবার সেই পদ্মা-মেঘনা-মহানন্দার বুকে মেহনতী মানুষের মাঝে উদ্ধারের নতুন 'মেসাইয়া' হয়ে। জলের কল্লোল ধোয়া, কম্র-ধুতরা-কন্টিকারির বুনো গন্ধ-শরীরে, রক্তাক্ত গাঙের দুঃস্বপ্ন বুকে, দুর্ভাগা দেশের প্রতি মমতার 'চন্দ্রবোড়া' মন নিয়ে সে জীবন সত্যিই এক 'কৈবর্ত্য পুরাণ'—

বহুকাল নদীগর্ভে শুয়ে আছি, প্রায়শ কঙ্কাল
হাত তুলে জলের উত্থান গণি, মাছ ও ভোদড়
খেলা করে, যমুনার নীল পানি উথালি পাথালি
যায়, লাল মাটি ভেঙে পড়ে ঝুপঝাপ, সাদা
পলিমাটি, ঈষৎ পাটলবর্ণ জীবাশ্মের ছাপ বুকে
মহানন্দা এবং আত্রাই থেকে পুণ্য করতোয়া
সবই তো জলের ধোঁয়া, ধুয়ে নিচ্ছে প্রশান্ত সরল
মানুষের কপালের ঘাম, রক্ত বীর্য, বাহু
বক্ষ, শ্রোণিদেশ। দেখি নদীগর্ভে আমার শরীর
মেশে কি মেশেনি শুধু কঙ্কাল আঙুলগুলো
জেগে আছে, কবে বেহুলা ভাসানে ভেসে ভেসে
পুণ্ড্র নগর ছেড়ে ভীমের জাঙ্গাল ধ'রে আল বেয়ে
বেয়ে, ইতিহাস করিডোর হা হা হাসির দমক
শুনলাম, ঘুমালাম, জেগে উঠে জলের কল্লোল
ছলচ্ছল মধুমতী ডিঙি বেয়ে পার হওয়া সোমত্ত

রাখাল পুত্র ললাটে ঘামের চিহ্ন, সুচিক্কণ
গোঁফটুকু, নকশী রূপাই আমি কৈবর্ত্যের ছেলে।
[আশরাফ, ২০১০ক : ২০৪-২০৫]

দুই

ঐতিহ্যচেতনা বাংলা কবিতার অন্যতম শরণ বলে বিশ্ববিস্মৃত হয়ে ছিন্ন কন্থা গায়ে দিয়ে কেবল ঐতিহ্যকে জপ করতে হবে — আঞ্চলিক ভাষায় মনের ভাবকে প্রকাশ করতে হবে এমন উত্তরাধুনিক কূপমণ্ডূকতায় বিশ্বাস করতেন না খোন্দকার আশরাফ হোসেন —

> এখন যদি কেউ মনে করেন, উত্তর-আধুনিকতার অর্থ হলো আবার নিপাট অপরিশীলিত উচ্চারণে ফিরে যাওয়া, কূপমণ্ডূক গ্রাম্যতার আবাহন করা, নিজ ক্ষুদ্র দেশপরিসরের মধ্যে সংকীর্ণ মানসিকতার গুহামধ্যে কালবিস্মৃত আস্‌হাব কাহাফের মতো ঘুম যাওয়া; বিশ্ব গোল্লায় যাক্ আমরা শুধু আউল বাউল লালন নিয়ে তৃপ্ত থাকবো , বাংলার আকন্দ-ধুন্দুল নিয়ে প্রাথম-জীবনানন্দের মতো মজে থাকবো, যা কিছু বিশ্বের ও সর্বমানবের তার উত্তরাধিকার দাবী করবো না, তবে সে হবে নিতান্ত আহাম্মকি। [আশরাফ, ২০১০গ : ১৬৪]

মূলত ঐতিহ্যাশ্রয়ী ছিলেন বলে কবি নাগরিকতাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করেননি। ঐতিহ্য ছিল তাঁর অন্তঃপ্রেরণা, নাগরিকতা ছিল অপ্রতিরোধ্য বাস্তবতা । 'কৈবর্ত্যের পুত'কে 'আর্যাবর্তে' আসতেই হবে — এ তার বিধিলিপি। খোন্দকার আশরাফ হোসেন নাগরিকতাকে আধুনিক মানুষের অনিবার্য বিধিলিপি বলে মনে করতেন — "আধুনিক কবিতা নগর-নির্ভর, কেননা নগর-নির্ভর হওয়া ছাড়া তার গত্যন্তর নেই।... আপনি না আসতে চাইলেও নগর আপনার কাছে উপস্থিত হবে তা নগর মানবসভ্যতার বিবর্তনের ডায়ালেকটিকসের ফল, একে পরিহার করার উপায়ও যেমন নেই, প্রয়োজনও নেই।" [নিসর্গ, ২০১৪ : ১৯৯]

নাগরিক জীবনের অসহায়ত্ব, বিপন্নতার মধ্য দিয়ে জীবনকে পরিপূর্ণরূপে চিনে নিতে এবং অর্জিত দর্শনকে প্রকাশ করতে আশরাফ তাঁর কবিতায় যে উপকরণকে বেশি আশ্রয় করেছেন, তা হলো 'মিথ' — যুগপৎ পাশ্চাত্য, ভারতীয় ও ইসলামি মিথ, প্রতীক ও উল্লিখন। প্রথম কাব্যগ্রন্থ *তিন রমণীর ক্বাসিদাতেই* গর্গনের তিন কন্যা কবির জীবন-মৃত্যু ও কর্মের নিয়ন্ত্রকের প্রতীক হয়ে যায় ।ট্রয় ধ্বংসের মতো মস্ত বিপর্যয়ের পরও তিনি অবশিষ্ট দায়িত্ব নিয়ে আশায় বুক বেঁধে 'ঈনিসে'র ন্যায় হেঁটে গেছেন সামনে — দৃপ্ত পায়ে পিতাকে কাঁধে নিয়ে ('অলৌকিক আশার মোজেস', *কাব্যসংগ্রহ* : ১৯)। আত্মঘাতী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকার প্রত্যয় জানাতেও বিচিত্র মিথই তাঁর অবলম্বন —

বুকের মধ্যে অনেক জ্বালা অনেক আগুন
হিমায়িত, মহাদেবের চুলের জটা আমার মাথা
আমার পায়ে ফোরাত নদীর জলের আঁচড়
আমার চুলে ট্রয় নগরীর
শেষ নারীটির দুঃখ বিলাপ,
...আমি ব্যর্থ পিপাসার্ত,

হায় হোসেন হায় বিলাপ নিয়ে তিনটি চড়ুই
উড়ছে আমার মাথার উপর —
আমার ঘোড়ার পায়ের দাগে জমতে থাকে অনেক ডিডোর
চোখের পানি [আশরাফ, ২০১০ক : ৫৩-৫৪]

সময়ের দুঃখ-অশ্রুপাত-হাহাকার, সন্ত্রাস-সংঘাতকে তিনি ধারণ করেছিলেন 'টিরেসি বৃদ্ধে'র মতো, শরীর ভরা ক্ষত নিয়ে আয়ুব নবীর মতো ['বাস কোথা যে পথিক', *কাব্যসংগ্রহ* : ৮৭]। যৌবনান্তে চোখের সামনে পুরনোকে নতুন অনশ্বর পথে বয়ে যেতে দেখেছেন একা 'এস্ত্রাগনের' মতো

দাঁড়িয়ে —
ভেসে যাচ্ছে, ভেসে যায়
কালস্রোতে জীবনযৌবন ধনমান,
কামিনীকাঞ্চন যায়, রাজার প্রস্থান যায়, শুধু
দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি প্রতীক্ষার দীন এস্ত্রাগন।
[আশরাফ, ২০১০ক : ২০৪]

মিথ-প্রয়োগে আশরাফ আধুনিক কবিদেরও ছাড়িয়েছিলেন কিন্তু তা আধুনিকবাদী হবার জন্য নয়।

তাছাড়া 'পোস্টমডার্ন'রাও মিথকে অস্বীকার করেননি — কিন্তু, রোলাঁ বার্থের তত্ত্বানুসারে তাঁরা মিথকে গ্রহণ করেছেন চিহ্ন-চিহ্নায়ক-চিহ্নায়িতের সম্পর্কে, 'সেমিওটিক' ভাষাতাত্ত্বিক নিয়মে।[৩] মিথকে তাঁরা দ্বিতীয় ভাষারূপে (Metalanguage) গণ্য করেন এবং তা প্রতীকরূপে কেবল একটি নির্দিষ্ট অর্থকে প্রকাশ করে না, বরং পাঠকের ইচ্ছা অনুযায়ী একটি মিথ ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যেয় হতে পারে। অর্থাৎ মিথের চিরন্তন শুভাশুভের ধারণা এবং প্রতীকায়ন রীতিকে ভেঙে দিয়ে তাঁরা মিথকে 'Language-object'রূপে উপস্থাপন করেন। মিথ তাঁদের কাছে একধরনের বাচনরীতি ব্যতীত কিছু নয় — 'a type of speech' [Barthe : 107-116]। সুতরাং, আশরাফের কবিতায় মিথের প্রতীকে জীবনকে পুরে দেয়ার এই রীতি মোটেই উত্তরাধুনিক নয়; বরং চিরন্তন। 'পোস্টমডার্নিস্ট'দের মতো জীবনবিচ্যুত বিমূর্ত মিথ সঞ্চয়ন আশরাফের অভিরুচি নয়। তাঁর কবিতায় মিথ জীবন-ভাবনারই বহিরাশ্রয়– প্রিয় পরিপূরক অনুষঙ্গ। মূলত মিথবিশ্ব ছিল তাঁর স্বোপার্জিত এক পরাজগৎ — আর্যাবর্তে এসে 'কৈবর্ত্যের পুতে'র সঞ্চিত অর্থে কেনা এক সুরম্য অট্টালিকা — আলোয়ান গায়ে দিয়ে যার কক্ষে কক্ষে তিনি ঘুরে বেড়াতেন জীবনের সারাৎসার সন্ধানে।

তিন

সত্তরের দশকে মিশেল ফুকো মানুষের আসন্ন মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন আর আশির দশকে দ্যেলুজ এবং গাতারির যৌথ ঘোষণা প্রকৃতির উপর থেকে মানুষের আধিপত্যকে হটিয়ে দেয়– মানুষ ও প্রকৃতি গণ্য হয় অভিন্ন সত্তায়, উৎপাদক-উৎপাদিতের সম্পর্কে

[Deleuze & Guattari, 1983: 4-5]। মাঝখানে সত্তরের দশকে আমেরিকার আধুনিকতা-বিরোধী তাত্ত্বিকদের (Anti-modernist) উত্তর-মানবিক (Posthumanist) দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে সম্পূর্ণ মহিমাচ্যুত করে। Leonard B Meyer, Ihab Hassan প্রমুখ তাত্ত্বিক মানুষকে মহান এবং পৃথিবীর কেন্দ্রীয় প্রসঙ্গরূপে আর দেখতে চাইলেন না — তাকে কীটপতঙ্গ, ব্যাকটেরিয়া, ইট, পাথর, নুড়ির মতোই সাধারণ ভাবলেন —

> Man is no longer to be the measure of all things, the center of the universe. He has been measured and found to be an undistinguished bit of matter different in no essential way from bacteria, stones, and trees. His goals and purposes; his egocentric notions of past, present, and future; his faith in his power to predict and through prediction, to control his destiny — all these are called into question, considered irrelevant, or deemed trivial. [Bertens, 1995 : 24-25]

মানুষের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ, তার সকল সুকৃতির ইতিহাস, শক্তি-সামর্থ্য-বিশ্বাস, নিজের মতো করে গন্তব্য নির্ধারণ — সমস্তই প্রশ্নবিদ্ধ হলো। নতুন ধারণার দৌরাত্ম্যে মানুষ কেন্দ্র থেকে পতিত হলো, যেমন দেবতারা শাপভ্রষ্ট হয়ে স্বর্গচ্যুত হন। মানুষকে নিয়ে পরিহাসের এই 'ইউটোপিয়া'কে খোন্দকার আশরাফ হোসেন সমর্থন করতে পারেননি — মানুষের অন্তিম ঘোষণাকারী এইসব 'দাঁড়কাক, তত্ত্বজ্ঞানী মত্ত মহাজন'দের স্পষ্টতই প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনি —

বড়ো বেশি ঠাট্টা হচ্ছে মানুষকে নিয়ে।
কারা যেন দিগন্তে পীতবর্ণ নিশান পুঁতছে,
আর হাঁকছে, মানুষের দিন গেছে গো, এবার
নুড়ি ও পতঙ্গের পালা, রামশালিক
আর কাঠকয়লার দিন
কারা শ্লোগান দিচ্ছে মানুষেরা নিপাত যাক, জিন্দাবাদ
হাতমোজা আর শ্যাওড়া কাঠের
নামাবলী-গায়ে অন্ধ পুরোহিত
বর্ণালীর যত রঙ নিয়ে কাব্য করে;
চাঁদের জমিন বেঁচে হাউজিং কোম্পানিগুলো
তীব্র কম্পন এলে মুখ থুবড়ে পড়বে এ নগরী — এরকম
ভবিষ্যদ্বাণী আশান্বিত করে তুলেছে যাদের,
তারা স্বপ্ন দেখে নয়া পৃথিবীর — মনুষ্যবিহীন। [আশরাফ, ২০১০খ : ৫১]

মানবতত্ত্ব ও মানবিকতাকে বিদ্রূপ করাটাকে এই তাত্ত্বিকদের নব্যরক্ষণশীলতা বলেই মনে করেছেন খোন্দকার আশরাফ হোসেন — ব্যথিত হয়েছেন মানুষের সমস্ত সংগ্রাম ও বিপ্লব, তার কীর্তি ও কাহিনি, শিল্প ও ভাস্কর্য — এ সমস্তকে 'বামিয়ান বুদ্ধমূর্তির মতো' ধসে পড়তে দেখে। দেরিদা ও ফুকোকে তিনি দায়ী করেছেন মানুষের মুখাগ্নির এই মর্মঘাতী আয়োজনের জন্য —

দিগন্তে সাজানো হচ্ছে মানুষের চিতা
আলোকের বিপরীত বিমানবিকতার যুগ্ম পুরোহিত
দেরিদা ও ফুকো মিলে শোয়াচ্ছে মানুষকে দেখি উত্তর শিথানে
বোল হরি হরিবোল বলে তার
শ্মশানযাত্রার কাল সমাগত প্রায়।
[আশরাফ, ২০১০খ : ৫১]

মানুষের অবমাননা এবং তার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার এই নতুন ইতিহাস খোন্দকার আশরাফ হোসেনকে পীড়া দিয়েছিল। কারণ, মানুষকে ভালোবাসতেন তিনি, যেহেতু মানুষ তার পঞ্জরাস্থি দিয়ে এই পৃথিবীকে গড়েছে এবং মানুষই আবার তা ধ্বংস করবে। এই ভঙ্গুর ও ভাঙনপ্রিয়, নম্য-বন্ধুর প্রাণীটি — যে কারো অধীন নয়, তাকে যোগ্য বলে মনে করতেন কবি — তাকেই উৎসর্গ করেছেন তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকর্ম —

মানুষকে কেউ ধারণ করতে পারে না
না নিসর্গ না ঈশ্বর না প্রেম না ঘৃণা
মানুষের হাতে নীল বেলুন তার চোখে দুই কালো মাছি
মানুষকে কেউ ধারণ করতে পারে না, মানুষের
কোনো জন্মদাতা নেই, তার কটির উত্তাল যৌবন কারো
উত্তরাধিকার নয়।
...আমি মানুষকে ভালোবাসি কেননা সে একদিন
নিজ হাতে নিজেকে পোড়াবে।
[আশরাফ, ২০১০ক : ৯১]

অবশ্য কবি কী মনে করেন, তাতে 'পোস্টমডার্নিস্ট'দের কোনো মাথাব্যথা নেই। কবি তো কবেই মৃত। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ' — সে কথাও আজ বাসি। অথচ, ধনতন্ত্রের সাথে প্রতিস্পর্ধা করে, সমাজতন্ত্রকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ধ্বংসের বিপরীতে নতুন প্রজন্মের এই যে স্বপ্ন-লক্ষ্যহীন আত্মক্ষয়ী আয়োজন — তাতে শোষক শক্তি কিছুমাত্র নির্জীব হয়নি, রক্তপাত থামেনি এখনো, পুঁজিবাদ বিন্দুমাত্র স্তিমিত হয়নি, বন্ধ হয়নি শ্রেণি-শোষণ। খোন্দকার আশরাফ 'মেটান্যারেটিভ'কে পরিত্যাজ্য ভাবেননি — বিশ্বাস করতেন যে, কোনো ঐতিহাসিক চিন্তনস্রোতই সময়ের সাথে সাথে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় না। বিশ শতকের শেষে 'মার্কসবাদে'র অবসান সূচিত হতে দেখেও বলেছেন — 'মার্কসবাদের ভেতরে এমন কিছু দুর্মর প্রাণকোষ রয়েছে যাদের মৃত্যু সহজে ঘটবে বলে মনে হয় না [আশরাফ, ২০১৩ : ৩৯]। মার্কসবাদী না হলেও তিনি পরম মমতায় তাঁর কবিতায় এঁকেছেন সীবনযন্ত্রে নিবদ্ধ 'পোশাকশিল্পের শ্রীরাধা' সকলের নিষ্করুণ, বিষণ্ন, মৃতস্বপ্ন জীবনের ছবি —

কাটাকাপড়ের স্তূপে দুহাতে খুঁজছে ওরা হারানো সময়
আর নীল শাদা লাল থানকাপড়ের উন্মুখ, উত্তাল প্রেম
তাহাদের ঘিরে রাখে অনন্ত কাফন ।
দ্যাখো অটোমেটিক সীবনযন্ত্রে তিনশ-তেত্রিশ জোড়া

হাতপা কনুই চিবুক
জোড়া দেয় নতমুখে, মাথার ওপরে বালব
তার নিচে চোখ
চোখের ভেতরে এক প্রজাপতি, তার নিচে কাঁচির হুংকার
তার নিচে খণ্ড খণ্ড তাহাদের স্তন ও জঘন। [আশরাফ, ২০১০ক : ১৪২]

আশ্চর্য হয়ে আশরাফ দেখেন, তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্রতম দেশের নিরন্ন মানুষগুলো টেরি কেটে, সেজে-গুজে ছোটে 'ট্রেডফেয়ারে' ['ট্রেডফেয়ার', ২০১০ : ৩৯], নগরীতে মৌলবাদ চলে প্রবল প্রতাপে ('বাস কোথা যে পথিক', *কাব্যসংগ্রহ* : ৮৭)। মহানগরী ঢাকার হরতাল ও সন্ত্রাস চমকে দেয় শেক্সপিয়রের প্রেতাত্মাকেও —

...শোনো,
হ্যামলেট, ম্যাকবেথ নাটকের অভিনয়, এখানেই জমবে
ভালো; প্রতিহিংসার নাট্যকলায় তোমরা বহুদূর
ছাড়িয়ে গেছ আমাকেও; আমি যাই —
[আশরাফ, ২০১০ক : ২১৫]

মারী-মড়ক আর বারবার বর্গির হামলা পেরিয়ে, জীবনকে বাজি রেখে যে মানুষ ছিনিয়ে এনেছিলেন স্বাধীনতা, 'অভ্রভেদী দুঃশাসনের তমসার মধ্যে পঞ্জরাস্থি জ্বালিয়ে' যিনি হতে চেয়েছিলেন অন্য নাবিকের জন্য 'বাতিঘর', তিনি কোনো অজাতশ্মশ্রু উত্তরাধুনিকের মতো রাজনীতি-সমাজ ও জীবননিরপেক্ষ কবিতা লিখতে চাননি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণের স্মৃতি থেকে আশরাফ রচনা করেছেন 'বাউসী ব্রিজ '৭১', 'সাহেবালি যুদ্ধে গিয়েছিলো', 'নোটনের জন্যে শোক'। আমাদের ইতিহাস-বিস্মৃতিকে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন বারংবার ('ফেব্রুয়ারিতে জনৈক বাগান মালিক', *কাব্যসংগ্রহ* :৭৮-৭৯) — অগণিত শহীদের ক্ষমাহীন বিদ্রূপে বিক্ষত হয়েছেন নিজে ('বধ্যভূমি থেকে', কাব্যসংগ্রহ: ২২৭)। সুতরাং, আধুনিক কবিদের মতো সাধারণ-বিযুক্ত আত্মভুক চেতনার অভিসারী তিনি নন, মতবাদী কবিদের মতো 'জীবনের জন্য শিল্প'কে শিরোধার্য মানেননি, পোস্টমডার্নদের মতো নিঃশর্তে কলাকৈবল্যের অনুগত হননি। রাজনীতি-সমাজ-ইতিহাস ও ব্যক্তিচৈতন্য তাঁর কবিতায় সমান্তর; পরস্পরবিরোধী সত্তায় বিপ্রতীপ নয় কখনো। তাই বর্তমানের দর্শনরিক্ত, মানববিবর্জিত এমনকি ব্যক্তিনিরপেক্ষ জড়সর্বস্ব কবিতাকে তাঁর পা বিহীন 'পাজামার' মতোই মনে হতো। বাংলাদেশের জনৈক উত্তরাধুনিক কবির 'বাড়ি'-নির্ভর কবিতা পড়ে কবি পরিহাস করে বলেছেন —

একটি বাড়ির দিকে হেঁটে এলো আরেকটা বাড়ি,
ভেতরে মানুষ কই? মানুষটা ছিল পুরাতন।
চেয়ারে ট্রাউজার দোলে, নীল জিন্‌স হাল ফ্যাশন
পুরনো পাদুটো শুধু হয়েছে উধাও, হোক্‌
নতুনত্ব থাক অবিচল
বল্‌ মন টিয়াপাখি রাধাকৃষ্ণ বল্‌। [আশরাফ, ২০১০ক : ১৫২]

চার

বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে বিশ্ব-কবিতা 'থিয়োরিস্ট' নামক তস্করদের ক্রীতদাসীতে পরিণত হয়। এতকাল সমালোচকেরাই ছিলেন সর্বেসর্বা। তাঁরা ভালোবেসে প্রেম ও কামনায় কবিতার হৃদয় ও শরীর স্পর্শ করতে চেয়েছেন — অর্জন করতে চেয়েছেন কবি ও কবিতার সন্নিহিতি। 'থিয়োরিস্ট'দের কাছে কবিতা হলো বিশুদ্ধ 'টেক্সট' — বিমূর্ত বল্লভা। তার নিজস্ব সত্তা বলে কিছু রইলো না — "অন্ধকার হয়ে আসা কবিতা-টেক্সটের চারদিকে এখন পণ্ডিতদের তাতা-থৈ-প্রেতনৃত্য" [আশরাফ, ২০১৩ : ৮৫]। 'অতি বিশ্লেষণে', 'জ্ঞানকাণ্ড' দিয়ে কবিতাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে তোলা, 'বহুস্বরিকতা'র নামে কবিতার দৈর্ঘচ্ছেদ-প্রস্থচ্ছেদ নিরূপণ, তার চেতনার অবভাসকে জাগিয়ে দেয়া এবং প্রকারান্তরে পাঠককে কবিতার কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরিয়ে তাঁদেরই নিজেদের পছন্দমতো প্রাকারের মধ্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ক্লান্ত করাটাকেই এই তাত্ত্বিকগণ কর্তব্য মনে করেন। খোন্দকার আশরাফ হোসেন বলেন— "টেক্সট দূরে চলে গিয়ে ঝাপসা হয়ে যেতে থাকে আউট অফ ফোকাস ছবির মতো; বড়ো হতে থাকে বীচি, কাকুড়ের তুলনায়।" [আশরাফ, ২০১৩ : ৮৪]। তাত্ত্বিকদের কবিতার নিবিড় পাঠের ফল কিন্তু হয় বিপরীত — ছিন্নভিন্ন, বিস্তৃত, পরিকীর্ণকরণ।

প্রাণাধিক প্রিয় বাংলা কবিতাকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গীয় উত্তরাধুনিক ও এদেশীয় নব্য 'ক্রিটিক'দের এরূপ অভিনব 'তত্ত্ব তালাশ' খোন্দকার আশরাফ হোসেনকে পীড়া দিয়েছে। তিনি একে 'পরকীয়ার টান' বলে নাকচ করে দিয়েছেন এবং উপন্যাসের বিশ্লেষণে বহুস্বরিকতাকে মেনে নিলেও কবিতায় আঙ্গিকবাদীদের এই স্বৈরত্বকে কিছুতেই বরদাস্ত করেননি — "আমার ভাবের ঘরে অনুপ্রবেশকারী; তার লগুড়াঘাত আমি সহ্য করতে অপারগ" [আশরাফ, ২০১৩, ৮৪]। অমলেন্দু চক্রবর্তী সম্পাদিত 'কবিতা-পরিচয়' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'দুঃসময়', 'সোনার তরী', 'প্রথম দিনের সূর্য ', 'প্রশ্ন' প্রভৃতি কবিতার বিচিত্র, অভিনব, স্বকপোলকল্পিত, অতিরঞ্জিত ব্যাখ্যাদি কিংবা জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কিত *অন্ধকারের উৎস হতে* গ্রন্থে আকবর আলী খান নামক জনৈক লেখকের 'বনলতা'-বৃত্তান্ত কবিকে বিস্মিত, ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত করেছিল নিঃসন্দেহে। আকবর আলী খানের যে কৃত্রিম, কূট, বক্র ও বিকৃত ব্যাখ্যা জীবনানন্দ দাশের কবিতার বনলতা সেনকে নিশ্চিতভাবে নাটোরের 'বারবনিতা'য় রূপান্তরিত করে, "কবিতার রাহসিকতা : বনলতা সেন" নামক প্রবন্ধ লিখে তার যথাযোগ্য জবাব দিতে খোন্দকার আশরাফ হোসেন বাধ্য হয়েছিলেন কবিতার প্রতি ভালেবাসার দায়বদ্ধতা থেকে। [আশরাফ, ২০১৩ : ৮৬-১০৪]। বস্তুত, আকবর আলী খান পাঠপ্রতিক্রিয়ার নামে জীবনানন্দ দাশকে যেভাবে আক্রমণ করেছেন এবং প্রকারান্তরে লম্পট ও নারীলোভীরূপে প্রতীয়মান করেছেন, যে কবির কবিতার সবচেয়ে বিরূপ সমালোচক সজনীকান্ত সেনও তা পড়ে শিউরে উঠতেন। কবিতার আস্বাদনের পরিবর্তে কবিকে লক্ষ করে এই কঙ্করপাতে কষ্ট বোধ করেছেন আশরাফ। তাই শেষ পর্যন্ত সাহিত্যতত্ত্বকে কবিতার জন্য 'বিনাশী' বলে মন্তব্য করেছেন। [আশরাফ, ২০১৩ : ১০৫]। কবিতার ভিন্ন ভিন্ন সমালোচনাকে অসংগত মনে করেননি আশরাফ, কবিতার ব্যাখ্যার জন্য সর্বদাই কবির দেশ-কাল-সংবেদনার সাক্ষী হতে হবে — এমনও ভাবেননি। কারণ, ফরাসী

প্রতীকবাদী কবি পল ভালেরির মতো তিনিও মনে করতেন মহৎ কবিতা 'স্বর্ণমুদ্রা'র মতো— "বিনিময় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েও সে স্বগুণে মহীয়ান — স্বর্ণমুদ্রার গায়ে মুদ্রিত রাজার মুখ কিংবা মূল্যমানের ছাপ উঠে গেলেও তার দামে হেরফের হবে না" [আশরাফ, ২০১০ : ৫২]। কিন্তু , নিবিড় পাঠের নামে কবিতার এমন নিগ্রহকে মেনে নিতে পারেননি তিনি — কখনো ক্ষুব্ধ হয়ে তাত্ত্বিকদের এই 'টেক্সট'-তল্লাসীকে 'শুয়োরে'র কন্দ অনুসন্ধানের নামান্তর বলে উপহাস করেছেন, কখনো সর্বস্বান্তের মতো আক্ষেপ করে বলেছেন —

> হায়, কবিতার আগের সেই দিন আর নেই, তার দিকে এখন আর কেউই নিবিষ্টভাবে তাকায় না। সমালোচক এখন কোনো একটা লাল কি নীল সুতা টেনে বার করেন কবিতার ঘনবুনোট থেকে, তারপর নিজের তত্ত্বধারণার বলে পেঁচাতে থাকেন, পেঁচাতে থাকেন, ক্রমাগত। দূরে আরো বহুদূরে সেই প্রস্থান, একসময় মূল যাত্রাবিন্দুও হয়ে যায় বিস্মৃত। কবিতা এখন সমালোচকের তাত্ত্বিকজ্ঞানক্রীড়া প্রদর্শনীর স্প্রিংবোর্ড মাত্র, যদিও ভনিতাটা থাকে নিবিড় পাঠের। [আশরাফ,২০১৩ : ৮৫]

পাঁচ

কিছু আপাত অভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে খোন্দকার আশরাফ হোসেনের কবিতাকে কখনো কখনো উত্তরাধুনিক স্বভাবের মনে হতে পারে। যেহেতু তিনি সংক্রান্তির কবি, সংকীর্ণচিত্ত নন এবং বাংলাদেশের নতুন কবিদের নিয়ে নিজেও উৎক্রান্ত হতে চেয়েছিলেন নতুন আধুনিকতায়, ফলে, উত্তরাধুনিক কবিতার কিছু 'ওয়েভ-লেংথ', কিছু 'চিন্তা তরঙ্গ' তাঁর কবিতায়ও আত্তীকৃত হয়েছিল অবচেতনভাবেই [আশরাফ, ২০১০গ : ১৬৮]। 'পোস্টমডার্ন' কবিতার 'হাইপাররিয়ালিটি', 'প্যারোডি', 'আয়রনি', উদ্ধরণ (quotation) তাঁর কবিতায় এসেছে নিজস্ব ভঙ্গিতে।

জা বদ্রিলাঁ কথিত 'হাইপাররিয়ালিটি' বা প্রতিরূপ বিভ্রান্তি (simulacra) হলো 'কল্পনা' ও 'বাস্তবের' মধ্যে সংগতি হারানো আধুনিক মানুষের শুশ্রূষাতীত এক অসুখ যা প্রতিনিয়ত বাস্তবের নানা প্রতিরূপজনিত ধাঁধা থেকে জন্ম নেয়, টেলিভিশন-গণমাধ্যম-বিজ্ঞাপনের বদৌলতে। [Baudrillard, 1983: 142]। আধুনিক কবিরা বাস্তবের প্রতিফলন ঘটাতেন 'রিয়ালিজম' এবং 'সুররিয়ালিজমে'র মাধ্যমে। আর, বাস্তবের প্রতিরূপ দেখতে অভ্যস্ত উত্তরাধুনিক কবিরা বাস্তবতার প্রকাশ ঘটান কবিতায় 'হাইপাররিয়ালিটি' বা অতিবাস্তবতা সৃষ্টির মাধ্যমে। খোন্দকার আশরাফ হোসেনের কবিতায় কখনো কখনো বাস্তবতা এবং অধিবাস্তবতার ফাঁক থেকে উঁকি দেয় অতিবাস্তবতার মুখচ্ছবি —

> ঢিল ছুঁড়ে আয়নাটা ভেঙেই দিলাম শেষতক।
> এখন বিবর্ণ কাঁচে শতচক্ষু কোকিলের
> বাক্যালাপ শুনি,
> গোলাপের লাল বুকে লেগেছে কামুক তীর
> (রোজ! ও রোজ!)
> দলগুলো পড়ে আছে ছিন্নভিন্ন চাঁদ।

... ...
আয়নার ভাঙা কাঁচে একটি জিয়ল কৈ লাফাচ্ছে ভীষণ।
রবীন্দ্রনাথের দাড়ি আর তার চোখের উদ্ভাস দেখে
স্তব্ধ কোকিলেরা
অকস্মাৎ মরি হায় হায় বসন্তের দিন চলে যায় বলে
গলায় বসাল ছুরি —
বিখণ্ডিত বিহ্বল তার দুটো চোখ
ছিটকে গেল দু'মিটার দূরে,
চূর্ণিত পায়ের কাছে অলৌকিক আলখাল্লা, শিশ্ন ও কলম।
[আশরাফ, ২০১০ক : ৯৪-৯৫]

আয়নার ভাঙা কাঁচে জিয়ল-কৈয়ের লক্ষ, বিচূর্ণ কাঁচে শতচক্ষু কোকিল কিংবা গোলাপের বিচ্ছিন্ন দলে ছিন্নভিন্ন চাঁদ অথবা রবীন্দ্রনাথের কাটা মুণ্ড ও ছিটকে যাওয়া চোখ মূলত 'পোস্টমডার্ন' প্রতিক্রিয়ারই রূপায়ণ — 'পোস্টমডার্ন' 'ফর্মে' 'হাইপাররিয়ালিটি'র মধ্য দিয়ে উত্তরাধুনিক সন্ত্রাসই চিহ্নিত হয়েছে 'হনন' কবিতায়। যদিও 'চিকন চাকুর ক্রূরতা' তিনি প্রথম থেকেই ভালোবাসতেন — নিজের ঘাতককে ডেকেছেন মুখোমুখি লড়বার জন্য ['আমার ঘাতক', *কাব্যসংগ্রহ* : ৯২], 'ছুরির ডগায় হাঁটা লাল পিঁপড়েকে' নিজের সময় বলে ভেবেছেন ['আমার সময়, আমি'; *কাব্যসংগ্রহ*: ১২৮] — অনেক আগেই বলেছেন 'সুরদাসে'র মতো — "গোলাপী চামচ দিয়ে তুলে নাও আমার দু'চোখ" ['নোঙর নামাও', *কাব্যসংগ্রহ* : ৩৮]। খোন্দকার আশরাফ হোসেনের কবিতায় ক্রমশ 'হাইপাররিয়ালিটি'র 'হরর' বাড়ছিল সময়ের সাথে সঙ্গতি রেখেই — বিশেষত 'সুন্দরী ও ঘৃণার ঘুঙুর' কাব্য থেকে শব্দব্যবহার ও পঙ্ক্তিবিন্যাস তার সমান্তর হয়ে উঠছিল —

ঠিক সোয়া বারোটায়
জলপরীদের সাথে দেখা হবে শোনা হবে গান
আমার স্নানের জন্য গামলায় কুয়াশার ফেনা
এত পাপ মানুষ হত্যার এত রক্ত এত কষ্ট দেনা
আরব্যতব্বুর কোন্ সুগন্ধি আতর
ধুয়ে দেবে?
জলপরীদের হাতে বুড়িগঙ্গা হাহাকার শুয়ে থাকে
বালুর মাদুরে দূরে সেতুর ওপারে
নাচে সাদা কুয়াশা চাদর
মানুষের রগকাটা চাঁদের কাটারি
হাওয়ার হাম্মামে ধোয় দেখি মাঝরাতের কসাই।
[আশরাফ, ২০১০ক : ১৩৯]

'হাইপাররিয়ালিটি'র আড়ালে ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস-নৈরাজ্য-হতাশার নগরীতে 'প্রুফ্রক'রূপী কবির অনুক্ত বেদনার স্বাক্ষর এই আধাবাস্তব-আধাপরাবাস্তব কবিতাটি। লক্ষণীয় যে, খোন্দকার আশরাফ হোসেনের কবিতার এই অতিবাস্তবতা পোস্টমডার্নিস্টদের বাস্তব ও কল্পনাবোধের অসংগতিজনিত কোনো স্পৃষ্টতা থেকে সৃষ্ট নয়, বক্তব্যবর্জিত কোনো বিশ্লিষ্ট

প্রলাপ নয় বরং বখে যাওয়া সময়ের জন্য কবির 'লখিন্দর'-হৃদয়ের স্বপ্নভঙ্গের বেদনা ও অভিমান থেকে তার জন্ম। কারণ, তিনি তো 'রাত্রির গাঢ় কুয়াশার সর দু'হাতে সরিয়ে' সূর্যের মতো 'আলোর বাটি'তে চুমুক দিতে চেয়েছেন ('জীবনের সমান চুমুক', *কাব্যসংগ্রহ* : ১০৫) — ক্রমাগত 'দীর্ঘশ্বাস তাস' উড়ে যেতে দেখেও তিনি শেষ পর্যন্ত আলোর আশ্বাসী—

আলোর আশ্বাস পেলে পুনরায় সাজাবো এখানে
বাহান্ন তাসের দীর্ঘ পেশেন্সের খেলা,
শিমুল ফুলের বুক ফেটে যাবে দীর্ঘশ্বাসে ফের
তুলার আদরে শ্বাসরুদ্ধ হবে সূচ
রাখবো বুকের মধ্যে অহংকারী বেলুনের অম্লান উড়াল,
কানা ছেলে ঘরে এলে রাজপথে হাঁক দেবে মূল ফেরিঅলা।
[আশরাফ, ২০১০ক : ১৩৮]

'শ্রেয়োবোধ'কে উত্তরাধুনিকদের মতো আশরাফ কখনো পায়ে ঠেলে দেননি, বরং অশান্তি, নৈরাজ্য ও সন্ত্রাস-প্রকম্পিত বর্তমান পৃথিবীতে তার প্রাসঙ্গিকতা ক্রমশ বাড়ছে বলেই মনে করতেন তিনি। 'শ্রেয়োবোধ' কবিতার চিরকালের আশ্রয় এবং তা চিরঞ্জীব হয়েই রবে — এই আশা পোষণ করেছিলেন তিনি [সমীর, ২০১২ : ৯৯]। তাই, খোন্দকার আশরাফ হোসেন যে কেবল 'হাইপাররিয়ালিটি' সৃষ্টি করার জন্যই কবিতাকে অতিবাস্তব করে তোলেন না, তা প্রতীয়মান হয় যখন প্রায়শই তাঁর অতিবাস্তব চিত্রগুলো পরাবাস্তবতায় রূপান্তরিত হয় অথবা, অতিবাস্তবতা ও পরাবাস্তবতা অভিন্ন হয়ে ওঠে —

ঘুঙুরের মৃত্যু হবে, রক্তবমি উঠে এসে
ভিজাবে বিছানো জাজিম আর তারপর চাঁদ তার চাকুটাকে
আকাশের পিঠে গেঁথে দিয়ে পালিয়ে যাবে দূরে
পার হয়ে নৌকার অমল গলুই। এখন
কান্নার ভেতর থেকে একটি রোমশ কুকুর গলা বাড়ায়,
তার চোখে শেষ রজনীর চাঁদ কসাইয়ের-ছুঁড়ে-দেয়া হাড়,
মানুষের চোয়াল কিংবা নিজেরই ডান হাত সে কামড়ে-কামড়ে
রক্তাক্ত করেছে, আজ রাতে শুরু হবে শেষ মুশায়েরা
মানুষ ও কুকুরের, অনিদ্রা ও ঘুমের মধ্যে যুগ্ম সেরেনাদ।
[আশরাফ, ২০১০ক : ১০১]

মূলত উত্তরাধুনিক কবিতার এই 'হাইপাররিয়ালিটি'কে খোন্দকার আশরাফ হোসেন পরাবাস্তবতারই নামান্তর বলে মনে করতেন। 'হাওয়া৪৯' গোত্রের উত্তরাধুনিক কবিদের কিছু কবিতার 'হাইপাররিয়ালিটি'র লক্ষণ দেখে তিনি বলেছিলেন — "একে কি পোস্টমডার্ন/উত্তরাধুনিকতার লক্ষণাক্রান্ত বলব ? এই অতিবাস্তব দুঃস্বপ্নমণ্ডিত পরাদৃশ্যের জগৎ কি আমরা আধুনিক কবিতায় দেখিনি?" এবং আব্দুল মান্নান সৈয়দের একটি পরাবাস্তব কবিতা উদ্ধৃত করে অভিন্নতা দেখিয়েছেন উত্তরাধুনিক 'হাইপাররিয়াল' কবিতার সাথে [আশরাফ, ২০১০গ : ১৫৫]। প্রকৃতপক্ষে, যেকোনো কবিতাই সময়ের উৎকণ্ঠাকে ধারণ করে হতে পারে আধুনিক বা উত্তরাধুনিক। একটি সার্থক উত্তরাধুনিক কবিতায়ও

থাকতে পারে জীবনের গূঢ়তর ব্যথা ও আনন্দ, লাভ-ক্ষতি, ভালো-মন্দ — অর্জন করতে পারে পাঠকের গভীর অভিনিবেশ ও আনন্দ-বেদনা-ভয়ের মিশ্রানুভূতি। আধুনিক বা উত্তরাধুনিক যাই বলা হোক কবিতায় জীবন ও শিল্পের এই ন্যূনতম সমন্বয়টুকু কাম্য ছিল খোন্দকার আশরাফ হোসেনের। কবিতা যেন 'পাটাফিজিক্স'-'মেটাফিজিক্স', 'মেটাফর'-'মন্তাজ', অতিবাস্তবতা-জাদুবাস্তবতার উন্মার্গগামী কোনো 'হাইপোরিয়ালিটি'তে পর্যবসিত না হয় — এটাই কাঙ্ক্ষিত ছিল তাঁর।

খোন্দকার আশরাফ হোসেনের কবিতার প্রচুর 'প্যারোডি' ও 'আয়রনি' স্বভাবকে 'পোস্টমডার্ন'-নিরীক্ষা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, আশির দশক থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর কবিতায় এই সহজাত স্বভাবটি এতই প্রকট যে তা একান্তভাবে উত্তরাধুনিক সংবহন বলে মনে হয় না। আধুনিক কবিরা কখনো কখনো রবীন্দ্রনাথের কবিতার চূর্ণ তাঁদের কবিতায় ব্যবহার করতেন। বিষ্ণু দে'র 'বেকার-বিহঙ্গ' কবিতাটি সবার মনে পড়বে। উত্তরাধুনিক কবিরাও প্রায়শই তাঁদের কবিতায় পূর্বজ কবিদের কবিতার পঙ্ক্তি ব্যাঙ্গার্থে 'প্যারোডি'রূপে ব্যবহার করে থাকেন। তাছাড়া সেইসব উদ্ধৃতি যত্রতত্র উদ্দেশ্য ছাড়াই ইয়ার্কিচ্ছলে অনর্গল ব্যবহার করা, এমনকি হুবহু উদ্ধৃতি (quotation) তুলে দেয়াটাও তাঁরা স্বীকৃত বলে মনে করে থাকেন। কারণ, চুরি (theft), ধার (borrow), দোমড়ানো-মোচড়ানো (twist) এবং বিকৃত করাটাকে (distort) তাঁরা কবিত্বের অন্তর্গত বলে মনে করেন। সমকালীন বাঙালি কবিদের কবিতায়ও 'প্যারোডি'র প্রয়োগ চলছে।

যেমন, জীবনানন্দ দাশের 'সুরঞ্জনা' কবিতার সম্পূর্ণ প্যারোডি করেছেন পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-আধুনিক কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়, নিম্নরূপে :

মালবিকা অইখানে যেওনাকো তুমি,
কথা কয়োনাকো অই যুবকের সাথে,
কী কথা তাহার সাথে? তার সাথে?
মালবিকা জানো তুমি ঘাসে কি লবণ?
সামনে দেওদার বন, আমি বসে আছি।
ফিরে এসো মালবিকা যুবকের সাথে তুমি যেওনাকো আর,
শান্তিনিকেতনে আমি দেখেছি পলাশ —
ও-পলাশে তোমাকে সাজাবো;
রাঙা ধুলো দিয়ে আমি তোমাকে সাজাবো;
ভালোবাসা দিয়ে আমি তোমাকে সাজাবো।
ফিরে এসো মালবিকা,
যুবকের সাথে তুমি যেওনাকো আর।
এখানে মন্দিরে-মেঘে আশ্চর্য ঝংকার —
ফিরে এসো মালবিকা, ইচ্ছে করো, এখনই এসো!
[নিতাই, ২০০৭ : ৩৪]

খোন্দকার আশরাফ হোসেন তাঁর কবিতায় এমন অজস্র উল্লিখন ও চূর্ণ ব্যবহার করেছেন অক্লেশে, ইচ্ছেমতো — কখনো ব্যঙ্গার্থে, কখনো প্রাসঙ্গিকভাবে, কখনো কেবল

আউড়ানোর জন্য। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা করেছেন যুক্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করে; কবিতার বক্তব্য প্রকাশের প্রয়োজনে, প্রবল শ্লেষে। যেমন —

ক. মানুষেরা বুকে হাঁটে, হাত পা তো বাঁধা দেয় জীবনের ঋণে,
(অর্ধেক গিয়েছে তার বেনোজলে, আর অর্ধ খরার দুর্দিনে)
[আশরাফ, ২০১০ক : ৩৭]

খ. অসীম হে তোমার শেষ যে না পাই
কবিকে দিয়েছ কুষ্ঠরোগীর সেলাম
কবিতাকে আনপড় খান্নাসের হাত
পুরস্কার প্রাপ্য শুধু বহুবল্লভার
[আশরাফ, ২০১০ক : ১৭৬]

গ. এ চোরাবালিতে ডেকো না আমাকে
দিগন্তের হে ঘোড়সওয়ার!
আমাকে ডোবাও আত্মভোলানো প্রখর পদ্যে
[আশরাফ, ২০১০ক : ১৬৬]

ঘ. বিষণ্ন সন্ধ্যায়
হরিণীরা ফিরিতেছে, বস্ত্রবালিকারা
যেন মৃণালিনী ঘোষালের শব
এইমাত্র উগরে দিয়ে গ্যালো
অদূর শহর থেকে প্যাসেন্‌জার বাস।
[আশরাফ, ২০১০ক : ২১২]

এখন যাঁরা কবিতার সাথে কবিকে সম্পর্কহীন মনে করেন, তাঁদের জানানো অনর্থক যে, খোন্দকার আশরাফ হোসেন ব্যক্তিজীবনে কী রকম প্রণোচ্ছল, পরিহাসপর ও অকপট ব্যঙ্গপ্রিয় ছিলেন। সেই স্বভাব ও মেজাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই 'প্যারোডি'কে তাঁর কবিতার অনুযাত্রী করেছিল — কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই তা 'পোস্টমডার্ন' স্বভাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাছাড়া, 'প্যারোডি' বিষয়টিও বাংলা কবিতায় আনকোরা নতুন নয়। এটিও কবিতার একটি চিরন্তন উপাদান। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাংলা কবিতা ও গানে 'প্যারোডি' বহুল প্রচলিত ছিল। পরে নজরুল-দ্বিজেন্দ্রলালও কম প্যারোডি করেননি। মূলত নতুন কাল এলে, পুরনো প্রবাদপ্রতিম অনেক কিছুও ঠাট্টার উপজীব্য হয়ে ওঠে — এটাই স্বাভাবিক। 'পোস্টমডার্ন'কালেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি ।

ছয়

দর্শন, অধিবিদ্যা ও মানববিরোধিতার সূত্রে ভাষাতাত্ত্বিক মোড় ফেরা (Linguistic turn) 'পোস্টমডার্নিজমে'র অন্যতম লক্ষণ। উত্তর-কাঠামোবাদীরা 'মেটাফিজিক্যাল' বিষয় থেকে ভাষাকে বিচ্ছিন্ন করে 'চিহ্নায়িত' ও 'চিহ্নায়কে'র জোড় ভাঙলেন। দেরিদার 'ডিকনস্ট্রাকশন' ভাষাকে ভেঙে তার মধ্যে বিবিধ অর্থের অনুসন্ধান শেখায়। সেই সূত্রে বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে পাশ্চাত্য কবিতায় আসেন ভাষাকোবিদগণ (Language poet), যারা মনে করেন কবিতায় বিষয় (Subject) ও দৃষ্টিভঙ্গি (Vision)

অপেক্ষা ভাষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ — ভাষার উপরিতল অর্থাৎ শব্দ তার গভীরতল বা নিহিতার্থ অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। মূলত এই কবিদের নিকট শব্দ-প্রক্ষেপণই কবিতা। তার অর্থ, ব্যঞ্জনা বা নান্দনিক যোগ্যতার তোয়াক্কা করেন না তাঁরা। কলা অপেক্ষা কৌশল এঁদের নিকট অধিক প্রিয়। শব্দ-বাক্য-পঙ্‌ক্তি-স্তবক নিয়ে এঁদের কলাকৌশলের শেষ নেই। কবিতাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না করে এঁরা দৃশ্যগ্রাহ্য করতে ভালোবাসেন। ভাষাক্রীড়াপ্রিয় (Language game) এসব নব্য নৈর্ব্যক্তিক কবিগণ (Objectivist poets) কবিতা রচনাকে বলেন ভাষা-লিখন (Language writing)। বিষয়বর্জিত (Antirepresentational), আত্মাভিমুখী (Self-reflexive), যুক্তি-শৃঙ্খলা ও ঐক্য-সংযোগহীন (Dislocated), নীরস শব্দসর্বস্ব এই শক্ত কবিতাগুলোর (Hard poetry) অর্থ বোঝা সত্যিই দুরূহ। গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে *Hills* (১৯৭৩), *L = A = N = G = U = A = G = E* (১৯৭৮) প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে 'পোস্টমডার্ন' কবিতার এই ভাষাগত সংলক্ষণটি বিস্তৃত হয় পাশ্চাত্যে [Bob, 1996: 16]। পাশ্চাত্যে ভাষামোদী মতবাদীদের খোন্দকার আশরাফ হোসেন বলেছেন ভাষার 'অনর্থবাদী' [আশরাফ, ২০১০গ : ১৪৩]। *পোস্টমডার্ন বাংলা কবিতার* মনুষ্যবিহীন জড়চরাচর এবং সংবেদনাহীন সারি সারি শব্দের মিছিল দেখে কবির মনে হয়েছে — এ কবিতার এক বিমূর্ত জগৎ, যে বিমানবীকৃত জগতে — "ওড়ে শব্দ, শুধু নীরক্ত ও বিরক্তিকর শব্দাবলি, হাজার কচলালেও যা থেকে বেরুবে না রস বা কষ" [আশরাফ, ২০১০গ : ১৫৫]। বাংলাদেশের আশির দশকের কবিতায়ও এরূপ ভাষাক্রীড়া দুর্লভ নয়। এদেশের জনৈক ভাষাকোবিদের একটি গাণিতিক কবিতা নিম্নে আংশিক উদ্ধৃত হলো :

এক
কবি = লতা এবং পাতা
নারী = কবির আশ্রয়
কবি যখন রৌদ্রের তাপে অসহায়
নারী তখন শীতল জলে কবিকে বাঁচায়।
দুই
অর্ধাঙ্গ + অর্ধাঙ্গ = নারী ও পুরুষ = সমতল প্রেম
পূর্ণাঙ্গ-অর্ধাঙ্গ-পূর্ণাঙ্গ = পরকীয়া প্রেম
পুরুষের পরকীয়া প্রেম সমুদ্রের
বেলাভূমিতে পায়ের ছাপ
রমণীর পরকীয়া প্রেম সমুদ্রের
শরীরে সূর্যের তাপ।
[রফিকউল্লাহ, ২০০৫ : ৬৯০]

কবিতা-জীবন-ভালোবাসার এমন সহজ গাণিতিক সমাধান এবং প্রগলভ ও নিশ্চেষ্ট দর্শনকল্প বাংলাদেশের কবিদেরও মাঝে মাঝে ভাষালিখনে প্রবৃত্ত করেছে। এ সব দেখেশুনে আশরাফের মনে হয়েছে যেন দূর থেকে কোনো ঔপনিবেশিক মায়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে ভাষার খেলায় ভুলিয়ে রেখেছে আমাদের। পশ্চিমা 'পোস্টমডার্ন' কবিতার অনুসারী 'হাওয়া ৪৯'-এর কবিতার সমালোচনা করতে গিয়ে কবি বলেছেন —

> *পোস্টমডার্ন বাংলা কবিতা* গ্রন্থে কবির পর কবি এরকম শব্দব্যায়াম করেছেন, ঢেলে দিয়েছেন 'উদ্দেশ্যরিক্ত', অর্থরিক্ত, পাঁশুটে সব উচ্চারণ। আছে গাণিতিক কবিতার নামে উদ্ভট অ-গাণিতিক উপপাদ্য উপস্থাপন, ভাষাকে অর্থের বাইরে নিয়ে যাওয়ার কী উদ্ভুত কসরৎ! দেখে শুনে আমাদের মতো অদীক্ষিতের মনে হয়, কোথাও একটা ষড়যন্ত্র আছে — ভুলিয়ে দেয়ার, নিজেকে, পরিপার্শ্বকে, ঐতিহ্যকে, ইতিহাসকে। ভোলাতে পারলে, অর্থহীনতার ফ্যান্টাসি জগতে ঘোরাতে পারলে কার যেন খুব সুবিধা হয়, কার যেন? কার? [আশরাফ, ২০১০গ : ১৫৭]

সুতরাং, বরাবর এই ধরনের ভাষা-কবিতার (Language poetry) বিরুদ্ধে কথা বলেছেন আশরাফ এবং তাঁর এমন একটি কবিতা নেই যেখানে বিনা কারণে অর্থরিক্ত শব্দেরা আনাগোনা করে ফেরে। যে কবিতায় বাচ্যার্থের অতিরিক্ত কিছুই থাকে না, এমনকি মননে বা মানসে কোনোই আন্দোলন তোলে না, এমন কবিতাকে আশরাফ 'ভুষিমাল, রঙচঙে তামা কিংবা রাং' বলে মনে করতেন [আশরাফ, ২০১০গ : ৫৩]।

ভাষার প্রকাশ-সক্ষমতাকে নির্মূল করার জন্য পোস্টমডার্ন কবিরা শব্দের হৃদয়কে কেবল উৎপাটন করেছেন তা নয়, শব্দকে করেছেন বোবা ও বিবস্ত্রপ্রায়। তার শরীর থেকে খুলে নিয়েছেন চিত্রকল্প, প্রতীকের আভরণ, ধ্বনির নূপুর, ব্যঞ্জনার বক্ষবাসটুকুও। 'পোস্টমডার্ন' কবিরা শব্দের শরীরী মোহে মেটাফর-বিলাসী। খোন্দকার আশরাফ হোসেনের কবিতায় চিত্রকল্প-প্রতীকের অপর্যাপ্ততা নেই। আর তেমন কোনো মেটাফর-মায়াতেও তিনি আবদ্ধ নন; রূপক-বিদ্বেষীও নন। আশরাফের কবিতায় উপমা-রূপক-চিত্রকল্প-প্রতীক প্রতিবেশীর মতো সদ্ভাবে থাকে।

> আমরা কাঠবিড়ালীর মতো ত্রস্ত আনন্দে লাফিয়ে পড়েছিলাম চরের মাটিতে।
> [আশরাফ, ২০১০ক : ৫৫]
>
> কিংবা
>
> খেলা করে মৎস্যশিশু আকোরিয়ামের শস্যখেতে
> যেমন কৃষকপুত্র পিতার ফলানো ধানে গড়াগড়ি যায়
> ...এখন জলের মধ্যে বিছায় শামুক তার বালুচরি শাড়ি
> কান্তি ও কল্যাণ যেন জীবনবাবুর মতো হিম হয়ে আছে,
> ঊর্ধ্ব-পাটাতনে নাও বেয়ে যায় ঘামমাখা চাঁদসদাগর
> উপরে রোদ ও বৃষ্টি, বাতাসের বেত্রাঘাতে চাষীর বুকের মতো
> জলের পাঁজর ভাঙে, অশ্রুপাতে ঋদ্ধ হয় কামিনী কাঞ্চন।
> [আশরাফ, ২০১০ক : ১০৩]

তবে, ভাষার প্রত্যক্ষতাই বেশি ভালোবাসতেন বলে প্রতীকাসক্তি ছিল খোন্দকার আশরাফ হোসেনের। তাঁর 'বৃক্ষের মতো বৃক্ষ দাঁড়িয়ে আছি', 'তিন রমণীর ক্বাসিদা', 'নানরুটি', 'চাকা', 'বাজপাখি' প্রভৃতি অসংখ্য কবিতায় ছোট-বড় প্রতীক ব্যবহার করেছেন। জীবন থেকে পাওয়া দর্শন ভালোবাসতেন বলে বিভিন্ন প্রতীক বেছে নিয়েছিলেন কারণ প্রতীক এক চিরন্তন অথচ পুনর্নব বহিরাশ্রয়। খোন্দকার আশরাফ হোসেনের একমাত্র রূপকাত্মক কবিতা, 'বেহুলা বাংলাদেশ'। সমস্ত সত্তায় রূপক-স্বভাবী হয়েও কবিতাটি বিষয়-বর্জিত, দর্শনহীন নয়। আশরাফের কবিতায় বেহুলা তার রূপ-মমতা-বিকার ও বিপন্নতা নিয়ে হয়ে

উঠেছে বাংলাদেশের অবিকল্প রূপকমূর্তি। এই রূপকায়নে উত্তরাধুনিকতা নেই, রয়েছে একান্ত আশরাফিতা।

আধুনিক কবিদের শব্দ-ব্যবহারের কৃচ্ছতা সাধনের বিপরীতে পোস্টমডার্ন কবিরা কবিতায় যেভাবে খুচরো পয়সার মতো অনর্গল শব্দ ছড়িয়েছেন, আশরাফ তেমন অপচয়ী বা কৃপণ কখনোই হননি। ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি ভাষাকে স্থাপত্যধর্মী যেমন করেননি, তেমনি ভাষাকে ভাবের বিকেন্দ্রায়নের মাধ্যমও ভাবেননি। ভাব ও ভাষা তাঁর কবিতায় রাধা-কৃষ্ণের মতো যুগল মিলনে একাত্ম। কবিতায় ছন্দের রীতিতেও খোন্দকার আশরাফ হোসেন চিরন্তনের সাথী; 'চলতি হাওয়ার পন্থী' নন। তিনি একটিও গদ্য কবিতা লেখেননি। ছন্দকে তিনি কবিতা থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন ভাবেননি। কারণ, ছন্দোহীন কবিতাকে জল বিনা মাছের মতোই মনে করতেন তিনি [আশরাফ, ২০১০গ : ৫৪]। পরিহার করার চেয়ে তিনি ছন্দকে সক্ষম করে তোলারই পক্ষপাতী। সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণতা দেয়াই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। গদ্যছন্দে কবিতা না লিখলেও গদ্যছন্দের অন্তর্লীন ছন্দোতান তাঁকে দ্যোতিত করত। কিন্তু, নতুন কবিদের ছন্দোবর্জন তাঁর মনঃপুত ছিল না —

> ইদানীংকার ছন্দ থেকে মুক্তিপ্রয়াসী তরুণ কবিকুল বরং ছন্দোমুক্তির নতুন নতুন কৌশল ভাবতে পারেন, কিন্তু ছন্দোহীনতা যদি তাদের অন্বিষ্ট হয়, সে হবে সোনার পাথরবাটির সন্ধান, কেননা কবিতা ও সঙ্গীতের দ্বৈতাদ্বৈত যমজ বোনের মতো। হোক কাব্যছন্দ অথবা গদ্য ছন্দ, কবিতা থেকে ছন্দের দ্যোতনা পুরোপুরি ছেঁটে ফেলতে গেলে যা থাকবে তাকে কবিতা বলা যাবে কেবল ব্যতিক্রমের বেলায়। [আশরাফ, ২০১০গ : ৫৬]

তাই শব্দ ও সুরের 'গোপন পিরিতে' তিনি বেঁধেছেন তাঁর কবিতা।

সাত

খোন্দকার আশরাফ হোসেন মডার্ন নন, পোস্টমডার্নও নন। তিনি ক্লাসিককে করেছিলেন শিরোধার্য, রোমান্টিক ও আধুনিক কবিতার আলপথগুলো ধরে হেঁটেছেন, শেষপর্যন্ত সেই সব সংকীর্ণ পথগুলো এক দীর্ঘ, প্রশস্ত, মনোহর পথরূপে দৃষ্টিগোচর হয়েছে তাঁর কাছে — ক্রমাগত নতুন কবিদের পথচলায় কালে কালে যে পথ দীর্ঘ হয় — মহাকাল যে পথে ধুলা ওড়ায়। খোন্দকার আশরাফ হোসেন মূলত কবিতার আধুনিক কালটিকে কোনো পরস্পরঘাতী দ্বন্দ্বে দ্বিধাবিভক্ত দেখতে চাননি বরং সময়ের উৎকণ্ঠাকে ধারণ করে একটি ঘাতসহ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নান্দনিকতার নতুন মাত্রায় এক নতুনতর আধুনিকতায় উপনীত হতে চেয়েছিলেন। পৃথিবীতে নতুন নতুন প্রধাবনার সাথে সাথে কবিতার শৈলী পাল্টায় বারবার কিন্তু পরম্পরাহীন বলে কিছু নেই। অত্যুদ্ভিন্ন, আনকোরা নতুনও একদিন পুরনো হয়ে পরম্পরায় মেশে। একদা যে আধুনিকতার 'ঘোড়সওয়ার'রা দোর্দণ্ড গতিতে তাঁদের অশ্ব ছুটিয়েছিলেন, তাঁরাও আজ ইতিহাস। খোন্দকার আশরাফ হোসেন জানতেন — "কবিতার বিষয়বস্তু (তার প্রণোদনার সারকেন্দ্র) পাল্টায় না, পাল্টায় শুধু প্রকাশভঙ্গি।" [আশরাফ, ২০১০গ : ১৬৩] তাই দুই সহস্রাব্দের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আধুনিক ও

উত্তরাধুনিক ধারণার একটি যুগোপযোগী সমন্বয় তিনি চেয়েছিলেন — সংশ্লেষণের মধ্য দিয়ে একটি সুন্দর ও সমর্থ বর্তমান সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন কবিতার জন্য, বিশেষত বাংলা কবিতার জন্য —

> আমাদের কবিতার সামনে তাহলে পথ কোনটি? পথটি অবশ্যই হবে সংশ্লেষণের পথ। বিশ্বসাহিত্যের নানা তরঙ্গভঙ্গ আছড়ে পড়বেই আমাদের চেতনার উপল-উপকূলে, বহুকাল থেকেই তা পড়ছে। আমাদের কবিতার আঙ্গিক প্রকাশভঙ্গি অবধারিতভাবেই পাল্টাবে। পৃথিবীতে, জ্বলন্ত সূর্যের নিচে, নতুন বলে কিছু নেই। গুহামানব তার গুহাচিত্রে যে আনন্দ-বেদনা-প্রেম-কাম-মোক্ষের প্রকাশ ঘটিয়েছিল, সেই একই অনুভব প্রপঞ্চের দোলায় দোলায়িত হয়েছে হোমার-দান্তে- ভার্জিল-শেক্সপীয়র-মিল্টন-কীটস-কালিদাস-রবীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দ। ... যথার্থ নতুন কবি তাঁর নিজের ভঙ্গিটি আবিষ্কার করেন মাত্র। বিশ্বের নানা প্রান্তের কবিতার প্রকাশভঙ্গির নানা নিরীক্ষা চলছে। আমাদের কবিরা সেইসব টেকনিকের অনুকরণ করতে চাইতেই পারেন: এক দেশের কবিতা আন্দোলন (বলা উচিত ভঙ্গির আন্দোলন) অন্য দেশে অনুরণন তুলতেই পারে। কিন্তু কবিতার ভাববস্তুর যে রূপটি আমাদের কবিতায় বিধৃত হবে তাতে অনিবার্যভাবে আমাদের স্বকাল-স্বদেশ-স্বভূমির ছাপটি থাকবে এটাই আশা করা যায়। [আশরাফ, ২০১০গ : ১৬৩-১৬৪]

দুই শতাব্দীর সন্ধিবেলায় দাঁড়িয়ে সময়ের স্বণন, রণন, শীৎকার স্বত্ত্বেও ক্রান্তদর্শী কবি খোন্দকার আশরাফ হোসেন তাঁর অসাধারণ কালজ্ঞান, মাত্রাচেতনা ও দূরদৃষ্টি দিয়ে দিক্‌চক্রবালে ধেয়ে চলা দিঙ্‌মূঢ় বাংলা কবিতাকে তার গৃহের সন্ধান দিতে চেয়েছেন। কবিতার 'গোলকায়নে' (Globalization) বিশ্বাসী ছিলেন না বলে ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারকে বুকে নিয়ে, কবিতার 'স্বায়ত্তশাসন'কে সত্য জেনে হৃদয়সংবেদী কবিতা লিখতে চেয়েছেন তিনি। আমাদের কবিতা কোনো কুন্ডিল, পরাশ্রয়ী স্বভাবে তার কুল না হারিয়ে স্বাভাবিক স্বপ্রতিভতায় কাল-ধর্ম বুঝে অগ্রবর্তী হবে — এই আশায় সম্পন্ন ছিলেন তিনি। বাংলাদেশের কবিতাকে যাবতীয় ঔপনিবেশিক পক্ষছায় ও পরাশ্রয়িতা থেকে মুক্ত করে মূল ধারায় এক অনন্য নতুনত্বে উন্নীত করতে তরুণ, মেধাবী অনুজ কবিদের সাথে নিয়ে সম্মুখবর্তী হয়েছিলেন আশরাফ। উত্তরাধুনিকদের তিনি প্রতিরোধ করতে চাননি, নিজেকে কোনো বৃত্তের ভেতরও বদ্ধ করেননি — দুই শতাব্দীর মাঝখানে 'দীঘল চৈত্রে' বসে আশীর্বাদ করেছেন কালের নতুন যাত্রী কবিদের —

> তোরা যাবি, তোরা তো অবশ্যি যাবি, যা
> আমার যাত্রার ধ্বনি শুষে নেবে কাল
> চৈত্র সংক্রান্তির ঘূর্ণ্যমান পাতা আমি নববৈশাখের
> প্রমত্ত ডালের 'পর ঝুলে আছি আহত বৃশ্চিক
> কাকের ঠোঁটের মধ্যে কম্পমান থ্রি-স্ট্রোক ইঞ্জিন।
> তোদের প্রগাঢ় গতি চোখ মেলে চলে যায় সূর্যের ভেতর।
> [আশরাফ, ২০১০ক : ১৬১]

যতবার বাংলাদেশের কবিতার মূলধারার সন্ধান করা হবে, ততবার উচ্চারিত হবে খোন্দকার আশরাফ হোসেনের মৃত্যুঞ্জয়ী নাম নজরুল-জীবনানন্দ-জসীমউদ্‌দীনের ধারাবাহিকতায় ।

টীকা

১. It is necessary to overthrow the myth : The birth of the reader must be at the cost of the death of the Author; [Barthes, 1977 : 148]

২. We no longer have recourse to the grand narratives — we can resort neither to the dialectic of Spirit nor even to the emancipation of humanity as a validation for postmodern scientific discourse. But as we have just seen, the little narrative [*petit recit*] remains the quintessential form of imaginative invention, most particularly in science. [Lyotard, 1984: 60]

৩. I shall represent it in the following way, it being understood, of course, that the specialization of the pattern is here only a metaphor :

<table>
<tr><td rowspan="3">Language
MYTH</td><td>1. Signifier</td><td>2. Signifed</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3. Sign
I SIGNIFIER</td><td>II SIGNIFIED</td></tr>
<tr><td colspan="3">III SIGN</td></tr>
</table>

[Barthe, 1991: 113]

গ্রন্থপঞ্জি

খোন্দকার আশরাফ হোসেন (সম্পাদিত) (১৯৮৫)। 'একবিংশ', প্রথম সংখ্যা, নভেম্বর, প্যাপিরাস, ঢাকা।

খোন্দকার আশরাফ হোসেন (১৯৯৪)। *বাংলাদেশের কবিতা : অন্তরঙ্গ অবলোকন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

খোন্দকার আশরাফ হোসেন (২০১০) ক। *কবিতাসংগ্রহ*, জনান্তিক, ঢাকা।

খোন্দকার আশরাফ হোসেন (২০১০) খ। *আয়(না) দেখে অন্ধ মানুষ*, নান্দনিক, ঢাকা।

খোন্দকার আশরাফ হোসেন (২০১০) গ। '*কবিতার অন্তর্যামী : আধুনিক উত্তরাধুনিক ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*', নান্দনিক, ঢাকা।

খোন্দকার আশরাফ হোসেন (২০১৩)। *বাঙালির দ্বিধা ও রবীন্দ্রনাথ এবং বিবিধ তত্ত্বতালাশ*, নান্দনিক, ঢাকা।

নিতাই জানা (সম্পাদিত) (২০০৭)। *পোস্টমডার্ন বাংলা কবিতা*, বাণীশিল্প, কলকাতা।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০৭)। *পোস্টমডার্ন ভাবনা ও অন্যান্য*, র‍্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন, কলকাতা।

রফিকউল্লাহ্ খান (সম্পাদিত) (২০০৫)। *বাংলাদেশের তিন দশকের কবিতা ১৯৭১-২০০০*, একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা।

সমীর আহমেদ (সম্পাদিত) (২০১২)। *মুখোমুখি বসিবার আশরাফ হোসেন*, লেখাপ্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা।

সরকার আশরাফ (সম্পাদিত) (২০১৪)। *নিসর্গ*, ২৯ বর্ষ ০১ সংখ্যা, পুনশ্চ, কাঁটাবন, ঢাকা।

Bob Perelman (1996). *The Marginalization of Poetry : Language Writing and Literary History*, Prinston University Press, U.K.

Gilles Deleuze and Felix Guattari (1983). *Anti-Oedipus*, trans. Robert Hurley, Mark Seem, and Helen R. Lane; University of Minnesota Press, U.S.A.

Jean Baudrillard (1983). *The Precession of Simulacra*, trans. Paul Foss, Paul Patton and Philip Beitchman, Semiotext(e), U.S.A.

Hans Bertens (1995). *The Idea of the Postmodernism : A history*, Routledge, London & New York.

Lyotard, Jean-Francois (1984). *The Postmodern Condition : A Report on Knowledge*, translation from the French by Geoff Bennington and Brian Massumi, foreword by Fredric Jameson, Manchester University Press, U.K.

Michel Foucault (1970). *The Order of Things : An Archaeology of the Human Sciences,* Routledge, London.

Martin Heidegger (1978). *Basic Writings,* ed. David Farrell Krell, Routledge, London.

Roland Barthes (1977). *Image Music Text,* translated by Stephen Heath, Fontana Press, London.

Ronald Barthes (1991). *Mythologies*, translated from the french by Annette Lavers, The Noonday Press, New York.